KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 200	Place of Publication ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection KLMLG	Publisher আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title সমকালীন (SAMAKALIN)	Size 7"x9.5" 17.78 X 24.13 c.m.
Vol. & Number ১২/- ১৫/- ১৯/- ২০/- ২০/-	Year of Publication ভাদ্র ১৩৭১ ‖ Sep 1964 জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ ‖ June 1968 কার্তিক ১৩৭৮ ‖ Nov 1971 আষাঢ় ১৩৭৯ ‖ July 1972 অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ ‖ Dec 1972
	Condition Brittle Good ✓
Editor আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks

C.D. Roll No. KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

বিংশ বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৭৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

গান্ধী রচনাবলী
১ম খণ্ড ৫·০০
২য় খণ্ড ৫·০০
৩য় খণ্ড ৯·০০

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষা অধিকর্তা শ্রীপরিমল রায় সংকলিত

চিত্রে ভারতের ইতিহাস ৪·৬২

ভারতীয় জাতীয় প্রদর্শশালার সংরক্ষক শ্রী সি. শিবরামমূর্তি কর্তৃক সংকলিত এবং ভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃত বিষয়ক মন্ত্রণা-দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত মূল পুস্তকের বাংলা সংস্করণ

ভারতীয় প্রদর্শশালাসমূহের বিবরণপঞ্জী ২০·০০

ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান আর্কিওলজি পুস্তকের বাংলা অনুবাদ

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব ২·০০

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই. এ. এস রচিত

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি ৩·৭৫
(পুস্তক বিক্রেতাদের জন্য ২০% কমিশন)

বাঙলার উৎসব—শ্রীতারাপদশঙ্কর চক্রবর্তী ১·২৫
বাঙলার শিকার প্রাণী—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র ৩·০০
দেশের গান—শ্রীভবতোষ দত্ত ·৫০
বাঙলার লোকনৃত্য—শ্রীমণি বর্মন ২·৯০
খনার বচন—দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ২·৫০

ডাকযোগে অর্ডার দিবার ও মনিঅর্ডার পাঠাইবার ঠিকানা :—
সুপারিন্টেনডেন্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাবলিকেশন ব্রাঞ্চ
৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭
নগদ বিক্রয় : পাবলিকেশন সেল্‌স্ অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা-১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ৪১১৯/৭২

বিংশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ তেরশ' উনআশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

প্রাচীন বাঙলার কয়েকজন অপরিচিত কবি ॥ প্রণব রায় ৩৯৩

বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ॥ সৌরীন ভট্টাচার্য ৪০২

একটি অপ্রচলিত মঙ্গল কাব্য ॥ ত্রিপুরা বসু ৪১১

বঙ্কিম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ডু ৪১৬

নাট্য প্রসঙ্গ : রাজতন্ত্র ॥ রবি মিত্র ৪২৩

আলোচনা : 'পুথি পাঠ' সহজ নয় : বিপিনবিহারী দাস। অক্ষয়কুমার কয়াল ৪২৫

সমালোচনা : প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ ॥ অধীর দে ৪২৮
বিদ্যাসাগর পরিক্রমা ॥ সতিৎশেখর মজুমদার ৪৩০

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

How The Income Was Spent In 1971-72

KESORAM RECEIVED	PERCENTAGE	AMOUNT (IN LACS)
From sale of its products and other income (Net)	100%	3214·06
THESE RECEIPTS WENT :—		
To Suppliers for goods consumed and services rendered for manufacture	54%	1730.51
To Employees as Salaries Wages, Bonus and Staff Welfare Benefit Plants	18%	593.14
To Interest	4%	118.68
To Excise Duty	13%	414.06
To Provide for depreciation of plant & machinery	3%	113·11
To Miscellaneous expenses	4%	114.84
To Surplus	4%	129.72
	100%	3214.06

Kesoram Industries & Cotton Mills Ltd.
BIRLA BUILDING
9/1, R. N. MUKHERJEE ROAD,
CALCUTTA-1

অগ্রহায়ণ
তেরশ' উনআশী

সমকালীন

বিংশ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

প্রাচীন বাঙলার কয়েকজন অপরিচিত কবি

প্রণব রায়

কালের করাল দৃষ্টি এড়িয়ে ও ইতিহাসের নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের যে সব প্রাচীন পুথিপত্র আজও টিকে রয়েছে, বর্তমানের উন্নত ছাপাখানার যুগে তারা আজ নিতান্ত উপেক্ষিত। নগরের খ্যাতনামা গ্রন্থাগার বা গড়ে ওঠা কোন প্রাচীন পুথির সংগ্রহশালার অন্ধকার ঘরই আজ তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। খ্যাতনামা কোন কোন কবির পুথি এই অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে সাহিত্যরসিকের হাতে ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ ক'রে। মধ্যযুগের বাঙলার যে সব কবির ভাগ্যে খ্যাতি জুটে নি, তাদের পুথি হয় আজ চিরতরে লুপ্ত অথবা কোন সংগ্রহশালা বা অখ্যাত পল্লীর এক কোণে নিতান্ত অবহেলিত হয়ে কৌতূহলী গবেষকের দৃষ্টির বাইরে থেকে আস্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

গত ১১ই কার্তিক, ১৩৭৮ 'অমৃতে' আঠার শতকের কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী ও তাঁর অপ্রকাশিত পুথি সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং ঐ পত্রিকারই ৯ই অগ্রহায়ণ সংখ্যায় কবি প্রাণবল্লভ ঘোষ ও তাঁর অপ্রকাশিত জাহ্নবীমঙ্গল পুথির কথাও সংক্ষেপে বলেছি। এই দুই কবির পুথিগুলি কালের ক্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে আজও বেঁচে আছে। লেখক সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল অঞ্চল থেকে আরও দু-একটি পুথি সংগ্রহ করেছেন। এ পুথিগুলির কবি সম্পর্কে আজও বোধ হয় কারোর কিছু জানা নেই। এসব কবির রচনার সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু না থাকলেও এককালে গ্রাম বাঙলার নিরীহ মানুষের কাছে এঁদের রচনা যে সমাদর লাভ করতো তাতে সন্দেহ নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে এসব পুথির কবিদের নাম ছাড়া আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। তবে এঁদের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যেতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য এই কবিরা হলেন, মহিলা

কবি মাধবলতা ও দ্বিজ বাঞ্ছারাম।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে তথা মঙ্গলকাব্যে মহিলা কবির সংখ্যা নেই বললেই হয়। এ ক্ষেত্রে মাধবলতা বা মাধবীলতা একটি অবিস্মরণীয় নাম। অবশ্য, সতের শতকের মনসামঙ্গলের কবি বংশীদাস চক্রবর্তীর কন্যা চন্দ্রবতীও যে কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন তা জানা যায়। শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে মাধবীলতার সুবচনীর পাঁচালী পুথির উল্লেখ করেছেন। মাধবীলতার এই পুথিটি বর্ধমান সাহিত্য সভার পুথিশালায় সংরক্ষিত আছে। পুথির নং ২৮০। ডঃ সেন মাধবীলতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "নারী কবির এমন ধরণের বাঙ্গলা রচনা ইতিপূর্বে পাওয়া যায় নাই।" লেখককর্তৃক অতিসম্প্রতি প্রাপ্ত সুবচনীর পাঁচালী পুথিটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং এর রচয়িত্রীর নাম মাধবলতা। পুথিটি লম্বায় প্রায় ষোল সতের ইঞ্চি এবং চওড়ায় আড়াই তিন ইঞ্চি। ঈষৎ হলুদ রঙের তুলট কাগজের দু পৃষ্ঠায় লেখা। পত্রসংখ্যা তিন ও পৃষ্ঠাসংখ্যা ছয়। পৃষ্ঠাঙ্কের কোন উল্লেখ নেই। হস্তাক্ষর কাঁচা ও বহুস্থানে বর্ণাশুদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। এই ক্ষুদ্র পুথিটি কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তীর পৌত্র রামধনের পৌত্র নীলমাধব চক্রবর্তীর বলে পুষ্পিকায় বলা হয়েছে। পুষ্পিকাটি নিম্নরূপ :

বেদের প্রমাণ এই পুরাণ প্রকাষ।
রচিলেন মাধবলতা কহিলেন ব্যাস॥

ইতি এ পুস্তক শ্রীনিলমাধব দেবসর্ম্মা॥ সাং বেঙ্গয়ালী পরগণে বরদা জেলা হুগুলি থানা ঘাঁটাল॥ সন ১২৭৬ সাল তাং ২৬ আসাড়॥ শুক্রবার বেলা দেড়প্রহরের সময় আরম্ভ॥ সমাপ্ত হইল বেলা দুই প্রহরের সময়॥

আজ থেকে একশ দুই বছর আগে বর্তমান ঘাটাল থানাটি যে হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত (বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত) এই পুষ্পিকা থেকে তা জানা যায়। নীলমাধব দেবশর্মা এই হুগলি জেলার (বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার) ঘাটাল থানার অধীন বরদা পরগণার বেঙ্গয়ালী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবত বরদা পরগণার ঐ অঞ্চলে মাধবলতার সুবচনীর পাঁচালী বিশেষ চলিত ছিল। সুবচনীর ব্রতমাহাত্ম্য কথা তখন পল্লীরমণীদের বিশেষ আকৃষ্ট করত। নীলমাধব খুব সম্ভব পৌরোহিত্য অথবা পারিবারিক প্রয়োজনে অন্য কোন পুথি থেকে মাত্র অর্দ্ধপ্রহরের মধ্যে সুবচনীর পাঁচালীটি লিখে নিয়েছিলেন ১২৭৬ সালের ২৬শে আষাঢ় তারিখে। তাড়াতাড়ি লেখার জন্যে বহু বর্ণাশুদ্ধি রয়ে গিয়েছে এ পুথির মধ্যে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় রচনারীতি লক্ষ্য করে মাধবলতাকে উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কবি বলে মনে করেন। অবশ্য এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন তারিখ জোর করে বলা যাবে না। লেখক কর্তৃক প্রাপ্ত বর্তমান পুথিতে ও রচনাকালের কোন উল্লেখ বা রচয়িত্রীর কোন পরিচয় নেই। তবে রচনার ভাষা ভালোভাবে লক্ষ্য করলে ডঃ সেনের মতামতকে উপেক্ষা করা চলে না। এ প্রসঙ্গে মাধবলতার সুবচনীর পাঁচালী পুথির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল :

৺শ্রীশ্রীদুর্গা অথ সুভচনির পালা লিক্ষ্যতে।

প্রথমে বন্দিব গুরু দেবের চরণ।

ক্রপা করি চক্ষুদান দিল জেই জন॥
গনেষদেবতা বন্দ গৌরীর নন্দন।
একদণ্ড (যোগ ?) মায়া বিঘ্নি বিনাষন॥
প্রণমোহ সুভচনি পরম দেবতা।
সংসারের সার তুমি ত্রিভূবন মাতা॥
হরগৌরী বিধি জার পাদপদ্ম সেবে।
উর্দ্ধে সে প্রণাম করে ইন্দ্র আদি দেবে॥
সুন ২ নরলোক হয়্যা একমন।
জেরূপে পাইন বর ভিক্ষক ব্রাহ্মণ॥
নগর ভিতরে ভিক্ষা মাগে চিরকাল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দুহে বড়ই কাঙ্গাল॥

সুবচনী পাঁচালীর কাহিনী হল কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর বহুকাল পরে দেবী সুবচনীর বরে একটি সুন্দর ছেলে হয়। কিন্তু দেবীর আদেশ হল ব্রাহ্মণ পুত্র মুখ দেখলেই মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। এক দৈবদুর্যোগে ব্রাহ্মণী না থাকায় ব্রাহ্মণ ছেলে কোলে নিয়ে তার মুখদর্শন করলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা গেলেন। এর পরের কাহিনী বড়ই করুণ। ব্রাহ্মণ কুমার বড় হয়ে দুখিনী মায়ের দুঃখমোচনের জন্যে ভিক্ষা করতে লাগল। কিন্তু একদিন ভিক্ষা না পেয়ে সে দেশের রাজার এক সরোবরে বহু হাঁস চরতে দেখে তাদের মধ্যে একটি খোঁড়া হাঁসকে নিয়ে এল এবং তার মাংস রান্না করে সুবচনীকে নিবেদন করে ভক্ষণ করল। এদিকে রাজা খবর পেয়ে ব্রাহ্মণীর ছেলেকে ধরে নিয়ে এলেন আর তার বুকের উপরে পাথর তুলে দিয়ে কারাগারে রেখে দিলেন। মায়ের করুণ ক্রন্দন আর চোখের জলে দেবী সুবচনীর আসন টলল। তিনি এলেন,

রক্তবস্ত্রপরিধান হংসবাহিনী।
চতুর্ভুজরূপে দেখা দিল নারায়ণি॥

সুবচনীর দয়ায় হাঁস আবার বেঁচে উঠল এবং রাজা স্বপ্ন দেখলেন যে দেবী বলছেন ব্রাহ্মণকুমারের কোন দোষ নেই। এরপর মাও ছেলের ভাগ্য ফিরল। অর্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা লাভ করল ব্রাহ্মণকুমার।

পুথির একটি পৃষ্ঠায় সুবচনীর আরেকটি কাহিনী পাওয়া যায়। এটি কতকটা আগের কাহিনীর মতো—তবে সুরুটি একটু আলাদা। এ কাহিনীর রাজা হলেন কলিঙ্গদেশের। সে রাজ্যে এক অনাথা তাঁর একমাত্র ছেলেকে নিয়ে অতি দীনভাবে জীবনযাপন করতো। যথাকালে ছেলেকে মা পাঠালেন পাঠশালে। অনাথা দুখী মায়ের ছেলের অন্যান্য পড়ুয়াকে ভালো ভালো জিনিষ খেতে দেখে লোভ হল। একদিন ছেলেটি শুনল তার পড়ুয়া বন্ধুরা পাখীর মাংস রান্না করে খাবে। সেকথা শুনে মায়ের কাছে গিয়ে সে জানায়। ছেলের মাংস খাবার সাধপূরণের জন্যে মা রাজার হাঁসপাল থেকে সন্ধ্যাবেলা একটি খোঁড়া হাঁসকে এনে ছেলের জন্যে রান্না করে দিলেন। পরে রাজার লোক ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল। এর পরের কাহিনী আগের কাহিনীর মতো। সুবচনীর

পাঁচালীতে কবির ভণিতা হল :

যুভচনির পাদপদ্ম করিয়া ধেয়ান।
রচিল মাধবলতা অপূর্ব কথন ॥

দ্বিতীয় কাহিনীর ভণিতায় মাধবলতার নাম নেই। এর ভণিতাটি হল :

আছাড় খাইয়া পড়ে কেস নাহি বান্ধে।
তারিণী ব্রাহ্মণি ভণে দ্বিজনারী কান্দে ॥

সুবচনীর কাহিনী অন্যান্য ব্রতকথার কাহিনীর মতো প্রাচীন বলেই মনে হয়। মহিলা কবি মাধবলতা এ কাহিনীকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর পাঁচালীর বিষয়বস্তুরূপে। মাধবলতার কোন পরিচয় এখনও জানা যায় নি। তবে মনে হয় কবির জীবনে যে বিষাদময় অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল তা তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দ্বিতীয় কাহিনীতে 'তারিণী ব্রাহ্মণী ভণে' বলতে তারিণী নামে অপর কোন মহিলা কবির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কিন্তু কাহিনীর পূর্বাংশ ছাড়া তাঁর আর কোন রচনা পুথিতে নেই। মাধবলতার অপর নাম তারিণী ছিল কিনা জানার উপায় নেই। এ সম্বন্ধে আরও পুথিপত্র আবিষ্কার হলে সঠিকভাবে বলা সম্ভব হবে। দরিদ্র ব্রাহ্মণীর একমাত্র ছেলের সাধপূরণ এবং অর্ধেক রাজ্য-রাজকন্যালাভের আশায় সেকালের বাঙলার সব মায়েদেরই ছেলের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভাবনাই ধরা পড়েছে এ পাঁচালী কাব্যে। হয়তো মাধবলতাও তাঁর একমাত্র ছেলের জন্যে আশা করেছিলেন। তাই দ্বিজ নারীর অন্তরের ব্যথাটিকে সার্থক রূপদান করেছিলেন তাঁর কাব্যে। গরীব মায়ের গরীব ছেলের রাজ্য ও রাজকন্যালাভ হয়তো ঘটে নি, কিন্তু সব মায়েরই ছেলের জন্য যে বিরাট আশা তা রয়ে গেছে এ কাহিনীর মধ্যে। মাধবলতা মায়ের জীবনের এ আশা আকাঙ্ক্ষাকে মায়ের স্নেহভরা চোখেই দেখেছিলেন বোধ হয়। তাই মায়েদের জন্যে তিনি ব্রতকথা লিখে গেছেন তাঁদের অপূর্ণ আশা পূরণ করতে। মাধবলতার এ পাঁচালী খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সেকালে। তার প্রমাণ মেদিনীপুর অঞ্চলে মাধবলতার বহু পুথি আজও খুঁজলে পাওয়া যাবে। বর্ধমান সাহিত্যসভা ও বর্তমান লেখকের নিকট রক্ষিত পুথি ছাড়াও লেখকের পিতৃদেব শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সুরনাথ সংগ্রহশালায় সুবচনী পাঁচালীর এরূপ একটি ছোট পুথি সুরক্ষিত আছে। এ থেকেই মাধবলতার জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম মহিলাকবি হিসেবে মাধবলতার পুথির গুরুত্ব নেহাৎ কম নয়।

লেখককর্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন পুথিপত্রের মধ্যে আর একজন কবির নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি হলেন দ্বিজ বাঞ্ছারাম। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোথাও এ কবির নাম আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রাচীন তুলট কাগজে লেখা বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় আকারের একটি পুস্তিকায় সন ১১৬৩ সালে লেখা দ্বিজ বাঞ্ছারামের কয়েকটি পদ্যপূরণ, একটি দোহা, একটি দীর্ঘ চৌতিশা ও ছোট ছোট আরও কয়েকটি কবিতা খুবই উল্লেখযোগ্য। মোটা তুলট কাগজের প্রতি পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল কালো কালিতে লেখা এ পুস্তিকাটি দেখলে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। অন্যান্য প্রাচীন পুথির আকার ও আয়তন থেকে এর আকার ও আয়তন সম্পূর্ণ ভিন্ন। পুস্তিকাটিকে একটি সঙ্কলনগ্রন্থ-বিশেষ বললেও চলে। এতে জ্যোতিষ গণনা পদ্ধতি, ঝারফুঁক ও তুকতাকের মন্ত্রের সঙ্গে বাঞ্ছারামের

কবিতাও স্থান পেয়েছে। পুস্তিকার তিনটি স্থানে সালের উল্লেখ আছে। ১১৫৬ সাল দুবার ও ১১৬৩ সাল একবার উল্লিখিত হয়েছে। হাতের লেখা খুব স্পষ্ট ও সুন্দর। আজ থেকে দুশ বাইশ বছর আগে পুস্তিকার আকারের এই ছোট পুথিটিকে বর্তমানের মুদ্রিত কোন ক্ষুদ্রগ্রন্থের মতো দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। লেখার ছাঁদ ও হস্তাক্ষরও আঠারো শতকের লিপির মতো। মনে হয় কোন ব্যক্তি এটিকে একটি সঙ্কলন গ্রন্থ করতে চেয়েছিলেন। দ্বিজ বাঞ্ছারামও এতে স্থান পেয়েছেন।

প্রাচীন বাঙলায় বিশেষ করে আঠারো শতকের দিকে কবিতা-পূরণ রচনা কবিদের মধ্যে খুব চালু ছিল মনে হয়। রাজসভায় কবিদের কবিত্বের পরীক্ষা হ'ত কবিতার কোন একটি চরণ বা চরণের অর্ধাংশকে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণ কবিতা রচনার মধ্যে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে ভারতচন্দ্রের কবিত্বের পরীক্ষা হয়েছিল এভাবে। 'পায় পায় পায় না' অংশটিকে নিয়ে ভারতচন্দ্র রচনা করেছিলেন চৌপদী ছন্দের একটি ছোট্ট কবিতা। দ্বিজ বাঞ্ছারামও এধরণের রচনায় হাত দিয়েছিলেন। তাঁর একটি কবিতাপূরণ এখানে উদ্ধার করা হল। পূরণীয় বাক্যটি হল 'কিমিতি কিমিতি'।

বপু জন্ত কুজি ভৃত্যা···তি জপ্তি ধর‍্যা।
শ্রবণযুগল বাক বিধি নিল্য হর‍্যা ॥
শুক্লকেশ মস্তকে বিশীর্ণা দন্তাবলি।
চক্ষে না দেখিতে পায় তিমির সকলি ॥
তথাপি নির্লজ্জ মন বিষয়ে স্পৃহতি।
বিপ্র বাঞ্ছারাম বলে কিমিতি কিমিতি ॥

হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের ছোট ছোট কিছু গল্পকেও বাঞ্ছারাম পদ্যাকারে রূপ দিয়েছিলেন। এসব গল্পের কোন কোনটির শেষাংশে নীতিবাক্যও আছে, যেমন,

বাঞ্ছারাম বলে নিচজন হলে
কটু না কহিবে তায়।
(অভি ?) মান উত্তর করে সে পামর
ক্ষণেকে মর্যাদা জায় ॥

এর সঙ্গে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে সুন্দরের বর্ধমান প্রবেশ বর্ণনায় একটি অংশের কিছু মিল আছে, যেমন,

নীচ যদি উচ্চভাবে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে
রায় বলে বটি বিদ্যাচোর।

রামায়ণ ও মহাভারতের কোন কোন কাহিনী অবলম্বন করে দ্বিজ বাঞ্ছারাম কয়েকটি ছোট ছোট কবিতাও লিখেছিলেন। এই কবিতাগুলির একটির ভণিতা নিম্নরূপ :

বাঞ্ছারাম দ্রুত ভারথের মত
পরিল শ্রীবর্দ্ধমানে।
দাস সর্ব্বানন্দে রাখিবে আনন্দে
ওহে প্রভু নারায়নে ॥

উক্তির প্রথমার্ধের অর্থ তেমন পরিস্ফুট নয়। দ্বিতীয়ার্ধে কবি সর্বানন্দের জন্য নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করেছেন। এই 'দাস সর্বানন্দ' কবির পোষ্টা অথবা প্রিয়ভাজন কোন ব্যক্তি কিনা বলা দুরূহ। ভণিতাটি অভিমন্যুর মৃত্যুতে শোকাহত অর্জুনের জয়দ্রথবধ নামক কাহিনীতে আছে। 'ভারথের মত' বলতে কবি মহাভারতের কথা মনে করেছেন না মহাকবি ভারতচন্দ্রের ইঙ্গিত করেছেন বুঝা যায় না। দ্বিজ বাঙ্কারামের আরও কয়েকটি ভণিতা পাওয়া যায়, যেমন,

(১) রচে বাঙ্কারাম বোধানুসারে।
সারদা সহায় সদত জারে ॥
(২) দ্বিজ বাঙ্কারাম রচে সারদার বরে।
নানা মত ভারত কে বর্ণিতে পারে ॥
(৩) দ্বিজ বাঙ্কারাম রচিল নব্য।
দোষ না লইবে জে জনা ভব্য ॥

মহাভারত ও রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত বাঙ্কারামের এযাবৎপ্রাপ্ত ছোট ছোট কবিতার সংখ্যা হল মাত্র ছয়টি। এছাড়া একটি দোহা গানে ও শ্রীমতী রাধাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব চৌতিশায় বাঙ্কারামের কৃতিত্ব কিছুটা লক্ষ্য করা যায়, যথা—

দোহা ॥ খিচত দুশাসন-দারুণ দ্রৌপদী ফিরত জেও নট থারি।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর সভাজন কোহিবা পুছত বত (?) শুধারি ॥
দেখি সভাজন জিউ অতি ভারি
কুন্তীবধূ পহলাজ ফুকারে লাজ রাখো ব্রজরাজ হামারি ॥

এর পর গদ্যের ভাষায় অংশটি হল,

শ্রীমতি রাধিকার কলঙ্কভঞ্জনার্থে সহস্রঝারাকলশে জমুনায় জল আনিতে শ্রীমতি জাত্রা করিছেন সেইকালে ঠাকুরকে স্তব করিতেছেন তাহা অবধান করুন।

এর পর স্তবচৌতিশার প্রথম কয়েকটি চরণ হল :

কলসী করিয়া কাথে কাঁদে কলাবতি।
কালাচাঁদ কর কৃপা করিহে মিনতি ॥
খাণ্ড গর্ত্ত ননদিনি হাসে খল ২।
খর্ব্ব কর খগপতি খল বলাবল।
গদাধর গোবিন্দ গোপাল গিরিধারি।
গর্ভ চূর্ণ গোপীনাথ গোকুলবেহারি।
ঘর হল্য ঘোর মোরে শুন ঘনশ্যাম।
ঘুর্যা পডি ঘন ২ বহে ঘোর ঘাম ॥

এভাবে চৌত্রিশটি অক্ষরের প্রতিটির দুটি করে চরণ কবি রচনা করেছেন। চৌতিশার শেষে যে ভণিতা আছে তা নিম্নরূপ :

অনক্ষণ রাখি মন শ্রীমতির পায়।
দ্বিজ বাঙ্কারাম গান স্তব চৌতিশায় ॥

দ্বিজ বাঙ্কারামের এ চৌতিশার কয়েকটি চরণের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের চৌতিশার কয়েক চরণের মিল সহজেই চোখে পড়ে। তবে ভারতচন্দ্র স্বরবর্ণগুলিরও নিপুণভাবে ব্যবহার দেখিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের চৌতিশাটি হল সুন্দরের কালীস্তুতির আর বাঙ্কারামের চৌতিশাটি কৃষ্ণস্তুতির। নীচের কয়েকটি পংক্তি থেকে উভয়ের কিছুটা মিল প্রতিপন্ন হবে :

১। (ক) গিরিজা গিরিশী গৌরী গণেশ জননী (ভারতচন্দ্র)
(খ) গদাধর গোবিন্দ গোপাল গিরিধারি (বাঙ্কারাম)
২। (ক) ছলে লোক ছি ছি বলে আঁখি ছল ছল (ভারতচন্দ্র)
(খ) ছল ছল মন ছলে করহ ছেদন।
ছি ছি জ লোকে বলে তেজিব জীবন ॥ (বাঙ্কারাম)
৩। (ক) ঢেসা দিয়া ঢেকা মারে ঢাক গো ঢক্কিনী (ভারতচন্দ্র)
(খ) ঢেস দিয়া ঢেমনা ঢেমনি উলে ঢঙ্গ (বাঙ্কারাম)

বাঙ্কারামের এ চৌতিশার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের চৌতিশার এরূপ আরও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাই মনে হয় বাঙ্কারাম ভারতচন্দ্রের কিছু পরে কবিতা রচনায় হাত দিয়েছিলেন। অন্তত খ্যাতিমান্ কবি ভারতচন্দ্রের রচনার সঙ্গে তাঁর যে বিশেষ পরিচয় ছিল তা বেশ বুঝতে পারা যায়। তাই বাঙ্কারামকে ভারতচন্দ্রের পরবর্তী মনে করলে বোধহয় অসঙ্গত হবে না। তবে আঠারো শতকের উত্তরার্ধে তিনি হয়তো কবিখ্যাতিলাভের জন্যে প্রয়াসী হয়েছেন।

বাঙ্কারাম খনার প্রবচনের আকারে কয়েকটি পদও রচনা করেছিলেন, যেমন,

তারাশুদ্ধি তত্ত্ব বলি ভাসায় শুসম।
জন্মতারায় যাত্রা করা বড়ই বিসম ॥
সম্পৎ সকল শুভ সর্ব্বত্র মর্যাদা।
বিপৎ আপদ বাড়া অতযেব বাধা ॥
ক্ষেমহেম সমতুল্য জানিহ তরায়।
প্রত্যরি পাপিষ্ঠ নানা উৎপাত করায় ॥
সাধকে বাধক নাক্রি অতি সুভ করা।
বধ বিসতুল্য ত্যাগ এই প্রাণহরা ॥
মিত্রাদি মিত্রসংজ্ঞা স্যু এই তারা লব।
বাঙ্কারাম দিজ বলে ইথে শুভাশুভ ॥

এছাড়া বাঙ্কারাম সপ্তসলাকার ভাষানুবাদও করেছিলেন। এই অনুবাদের শেষে ভণিতায় তিনি বলেছেন :

স্বাতি শতভীষা ক্ষাত বিসাখা ধনিষ্ঠা জ্ঞাত
সারদায় করিয়া প্রণাম।

সপ্তসলাকায় জত   ভাষিল ভাষার মত

বিজকুলোদ্ভব বাঙ্খারাম ॥

বাঙ্খারাম সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় নি। তবে তাঁর ভাষায় ধ্বনিপ্রাধান্য থেকে আঠারো শতকের শেষার্ধের বাঙলা সাহিত্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠে।

আঠারো শতকের বাঙলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান অবদান হল শাক্তপদাবলী। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের মতো শক্তিসাধকের শাক্তপদাবলী সঙ্গীত বাঙালীর অন্তরকে ভক্তিরসে সঞ্জীবিত করেছিল। বাঙলার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠত মাতৃরূপিনী শক্তির প্রতি ভক্তসন্তানের কাতর প্রার্থনায়। সেই মাতৃসঙ্গীত আজও সকলের প্রিয় ও ঘরে ঘরে আদৃত। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত ছাড়া আঠারো শতকের কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তীর ভক্তিমূলক কয়েকটি মাতৃসঙ্গীত আজও আমাদের অজ্ঞাতে রয়ে গেছে। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের মতো অকিঞ্চনের পদগুলির ভাবও উচ্চস্তরের। নীচে অকিঞ্চনের দু একটি পদ উদ্ধৃত করা হল। এর থেকে ভক্তিমূলক পদরচনায় অকিঞ্চনও যে রামপ্রসাদ কমলাকান্তের সমকক্ষ ছিলেন তা বুঝা যায়:

(১)   না বল্যা দুর্গার নাম অমনি দিন

গেল গো আমার দিন

বিজ্ঞান হরিয়া লেয়   কেন মা অজ্ঞান দেয়

ক্রিয়াহিন দেখ্যা দিন পায় ঠেল্যা পেল ॥

ইন্দ্রিয় হইল জালা   ঘটায় সর্পের মালা

ভজনে করিয়া জেলা   জমের জালা মাথায় কর‍্যা লিল্য ॥

জননীর গর্ত্তবাসে   জন্মিলাভ ভজন আসে

সৎকার্য করিব মনে ছিল।

ভজন পূজন ক্রিয়াস্তন্ত   দেখ্যা দুর্গা কৈল্যে দন্ত

বুঝি (বা ?) বিজন্তপুরে জাত্যে হল্য ॥

তোমার যুক্তে অধম বুদ্ধি   দিয়া নিল্যে সর্ব্ব-সিদ্ধি

ভজন হেলা কর‍্যা নিদান মল্য।

বারেক চায়্যা নয়ানকনে   ত্রান কর নষ্টজনে

দুর্গানামের গুনে তার‍্যা নিতে হৈল্য।

দ্বিজ অকিঞ্চন ডাকে   ভবানী তারিণী মাকে

জমের দুত্তের জালা দুরে ঠেল ॥

(২)   গো জননী সুকৃতি তরে আপন গুণে।

অকৃতি জনেতে   পার মা তারিতে

তারিণী নামটি লোকে মানে ॥

অমিয় বচন   সুধার সমান

সকল দেবতা কর্ণে শুনে।

বোবার বাণী   বিনে জননী

অন্তের মাতা নাস্তি জানে।

দুর্গা নাম্নি   মোক্ষধাম্নি

ক্রিয়া সমস্তা বেদে ভনে।

তায় গুরুর কথা   নগের সুতা

সার কর‍্যাছি প্রাণপণে ॥

দিন অকিঞ্চন   করে নিবেদন

দুর্গাদেবীর শ্রীচরণে।

তোমার চরণ   পতিত পাবন

স্মরণ দিয়া অন্তদিনে ॥

(৩)   ভবের ভবানী বল্যা মাকে কে জানে রে।

জার আছে ব্রহ্মজ্ঞান   সে জানে দুর্গার ধ্যান

গুরু উপদেষ মন্ত্র তন্ত্র নিরূপনে ॥

আগম নিগম সার   তারা বিনে নাস্তি আর

তরঙ্গে তারিতে অধম জনে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শূলপানি   নিশ্চয় কহিলা বানি

সাবিত্রী বৈষ্ণবী দুর্গা একই তিনে।

এক ব্রহ্ম বেদে কয়   ভেদজ্ঞান জাব লয়

পায় ব্রহ্মপদ সেষ দিনে।

দিজ অকিঞ্চন   সর্ব্বগুন্ত ক্রিয়াহিন

যে তারিবে ভবঘোরে দুর্গা বিনে ॥

উপরের এই কয়েকটি গানে সাধক কবির হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে। তাঁর এই গানগুলি হয়তো পল্লীর ভাবুক ভক্তের কণ্ঠে ধ্বনিত হত এককালে। কবি সম্ভবত রামপ্রসাদের আগে বা সমকালে এগুলি রচনা করেছিলেন। গানগুলির মধ্যে কবির সাধনলব্ধ অনুভূতিটি ধরা পড়েছে। যে ঐশ্বরিক উপলব্ধি সাধক রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত লাভ করেছিলেন শক্তিসাধনা করে, কবি অকিঞ্চনও বোধ হয় সেরূপ সাধনমার্গের এক উচ্চ কোটিতে এসে পৌছেছিলেন। তাঁর গানগুলি তাই মায়ের কাছে অবোধ শিশুর সরল অন্তরের আবেদনটিকেই প্রকাশ করেছে।

মাধবলতা, দ্বিজ বাঙ্খারাম ও অকিঞ্চনের মতো আরও অনেক পল্লীকবির রচনা আজও গ্রাম গ্রামান্তরের স্থানে স্থানে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন পুথি অনুসন্ধান করলে জানা যাবে।

উদ্ধৃতিগুলির ভাষা ও বানান মূল পুঁথির মতো অবিকৃত রাখা আছে।

বাংলার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

সৌরীন ভট্টাচার্য

উচ্চতর জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা এখনো আমাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি। আমরা যে ভাষায় দৈনন্দিন কাজকর্ম সারি সে ভাষায় বিদ্যাচর্চা করি না। আর তাই বিদ্যাচর্চা আমাদের জীবনে এখনো সহজাত নয়! তা যেন অনেকখানি কৃত্রিম, খুব পোষাকী কোন ব্যাপার। বাংলাভাষা কেন পঠন পাঠন, অধ্যয়ন, গবেষণার ভাগ হিসেবে স্বীকৃতি পায় না? এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয় না তা তো নয়। বরঞ্চ এ নিয়ে জল্পনা কল্পনা জমে উঠেছে অনেক। এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত যে শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষাই সর্বশ্রেষ্ঠ। উচ্চবিদ্যার চর্চায় কার্যকর এক ঋজু ভাষারীতি গড়ে ওঠে নি বলেই কি তবে এই দ্বিধা? গড়ে ওঠেনি বলে চুপ করে বসে থাকলে কোনদিনও তা গড়ে উঠবে না। আসলে ভাষার প্রশ্ন সবচেয়ে বড়ো হোঁচট খায় পরিভাষার প্রসঙ্গে। যে কোন আধুনিক বিদ্যাবিজ্ঞান কিংবা প্রযুক্তিবিদ্যা, দর্শন অথবা মনস্তত্ত্ব অথবা সমাজবিদ্যার যে কোন প্রশাখা যাই হোক না কেন—পরিভাষা ছাড়া অচল। কারণ, সাধারণ মানুষের মুখের যে ভাষা তা অনেক সময়ে বহুব্যবহারে জীর্ণ, অনেক সময়েই তা নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে অক্ষম। অথচ বিজ্ঞানের যা লক্ষ্য তা হল স্পষ্ট জ্ঞান। প্রমিতি তার প্রথম প্রত্যয়। কাজেই বিজ্ঞান যে ভাষাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে তা মুখের ভাষার থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। সেখানে অস্পষ্টতার কোন স্থান নেই। তাই প্রয়োজন পারিভাষিক শব্দের। যে ইংরেজি ভাষার মারফত আমাদের জ্ঞানচর্চা মূলত চলে সেখানেও গড়ে উঠেছে প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য পারিভাষিক শব্দের এক বিপুল সম্ভার। কাজেই বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা করতে গেলে এই পারিভাষিক শব্দের, অনুবাদ যদি না ও বলি, অন্তত বাংলা রূপান্তর অবশ্যই করণীয়। মুখর বিতর্ক এইখানে এসে প্রায় স্তব্ধ।

অথচ অন্তত শুরু করবার মত পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ আমাদের হাতের কাছেই ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় অনুসারে ভাগ করে মোটামুটি এক দীর্ঘ পরিভাষা সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। সে বই এর প্রথম সংস্করণ আজও ফুরোয় নি। এই সংগ্রহে কিঞ্চিদধিক এগার হাজার শব্দ স্থান পেয়েছিল। যে সব বিদ্যার থেকে এই শব্দ সংকলন করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, অর্থবিদ্যা, শারীরবৃত্ত ও স্বাস্থ্যবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা, মনোবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও ভূগোল। এ তালিকা নিশ্চয়ই পূর্ণ নয়, সংকলিত শব্দাবলির দোষ ত্রুটিও নিশ্চয়ই অনেক। কিন্তু কাজে না লাগালে তো সে সব ধরা পড়বে না, সংশোধন তো দূরের কথা।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা ছাড়াও ব্যক্তিগত প্রযত্ন ও পরিশ্রমে প্রস্তুত আরও দু একটি সংকলন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক বিদ্যাক্ষেত্র থেকে পারিভাষিক শব্দ চয়ন করে এক সুন্দর সংকলন প্রস্তুত করেছেন শ্রীঅপ্রকাশ রায়। 'পরিভাষা কোষ' নামে প্রায় ৮০০ শব্দ সম্বলিত তাঁর কোষগ্রন্থ

প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। এ ছাড়া আছে খুব সহজলভ্য 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান,' 'চলন্তিকা' ও শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার প্রণীত 'বিবিধার্থ অভিধান'। এইসব ছোটখাট অভিধানের পরিশিষ্ট অংশে বেশ কিছু পারিভাষিক শব্দের তালিকা দেওয়া আছে। এর কোনটিই আমাদের পুরো প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয় তো বটেই, তবে শুধুমাত্র শুরু করবার পক্ষে এ সব সংকলন অবলম্বন করেই হয়ত এগোন যেতে পারত।

বাংলায় পরিভাষা চর্চা যে নিতান্ত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা তাও নয়। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্য অনেক অংশের মত এরও সূত্রপাত হয়েছিল উনিশ শতকে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে সত্তর, আশি, নব্বই বছর আগের কোন বাংলা পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে যখন কোন প্রবন্ধ পড়ি তখন দেখি যে ঠিক আজকের মতই তখনকার লেখকদের দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব একই ছিল। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা প্রসঙ্গে দেখি সেই একই সংশয়, যার চেহারা আজও প্রায় অপরিবর্তিত, পরিভাষা প্রসঙ্গে দেখি সেই একই অভাববোধ। তবুও আমাদের পূর্বপুরুষেরা একেবারে অলস বসে ছিলেন না। যদিও তাঁদের ঐকান্তিক অধ্যবসায়েরও আমাদের সব প্রয়োজন হয়ত মিটবে না, তবুও নতুন করে এগোবার জন্য পূর্ব প্রচেষ্টা খুঁটিয়ে যাচাই করা দরকার।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা পদ্ধতি সম্পর্কে একটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। পরিভাষা চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস অন্তত দু'রকম ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। এক, বিভিন্ন সংকলকের আহৃত শব্দাবলি ধরে ধরে ভাষাতাত্ত্বিক এবং ধারণাগত দিক থেকে বিচার করতে করতে এগোন। দুই, শব্দের বিচার বাদ দিয়ে বিভিন্ন সংকলনের নির্দেশিত সাধারণ রীতিনীতি ও সংকলন পদ্ধতির আলোচনা ও বিচার। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে শব্দের বিচার আমার সাধ্যাতীত। এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনায়াস অধিকার ও ভাষাতত্ত্বের খুঁটিনাটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান। এর কোনটিই আমার নেই। আর তা ছাড়া শব্দাবলির সূক্ষ্ম বিচারের অবকাশও এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে নেই। বদলে আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করব।

১৩০৬ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বৈদ্যক পরিভাষা' নামে এক প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি যে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা শহরে পেটার রেট্‌ন্ সংকলিত একখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল। বই-এর নাম A vocabulary of the Names of the various parts of the Human Body and of Medical and Technical Terms in English, Arabic, Persian, Hindee and Sanskrit for the use of the Members of the Medical Department in India. এই বই-এ পরিভাষা সংকলন বিষয়ে সাধারণ রীতিনীতির খুব একটা আলোচনা না থাকলেও শরীরবিদ্যার বহু পারিভাষিক শব্দ এতে সংকলিত হয়েছিল। শব্দসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৬০০। পারিভাষিক শব্দাবলি বাংলা অনুবাদে অবশ্য এ বই-এ দেওয়া হয়নি। ইংরেজি সমেত আরবী, হিন্দি ও সংস্কৃত এই পাঁচটি ভাষায় শব্দাবলি স্তম্ভাকারে সাজান হয়েছিল! রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধে এই তালিকা উদ্ধৃত আছে। প্রত্যক্ষত বাংলা অনুবাদ যদিও নেই, তবে সংস্কৃত অনুবাদগুলি বিচার বিশ্লেষণের পর অনেকাংশে বাংলা রচনার কাজে ব্যবহার্য বলে মনে হয়।

এর পরে পরিভাষা রচনার যে নিদর্শন আমরা পাচ্ছি তা হল ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক জন ম্যাক্ প্রণীত Principles of Chemistry-র গৌড়ীয় ভাষায় অনূদিত এক সংস্করণ। জন ম্যাক্-এর বইতে যে শুধু পরিভাষা নির্দেশ করা হয়েছিল তাই নয়—বাংলা ভাষায় রসায়ণ শাস্ত্রের আলোচনাও এ বই-এ ছিল। এবং উল্লেখযোগ্য যে অতদিন আগের রচনা হলেও বিজ্ঞান আলোচনার ভাষা হিসেবে এই গদ্যরীতি বেশ উপযোগী। সাম্প্রতিক ভাষারীতির সঙ্গে তুলনার এই গদ্য একেবারে অনাত্মীয় বলে মনে হয় না। দু' একটি নমুনা উদ্ধার করছি।

"কিমিয়া বিদ্যা দ্বারা এই এই শিক্ষা হয় বিশেষতঃ নানাবিধ বস্তুজ্ঞান এবং সেই নানাবিধ বস্তু, যে যে ব্যবস্থানুসারে পরস্পর সংযুক্ত ও লীন হইলে এই বস্তু হইতে নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা।"

"কিমিয়া প্রভাব চারিপ্রকার। ১। আকর্ষণ। ২। তাপক। ৩। আলোক। ৪। বিদ্যুতীয় সাধন। অনুমান হয় যে অপর একপ্রকার চুম্বকীয় গুণ।"

"সোডিয়মের খোরিণ অর্থাৎ সামান্য লবণের ৮ ঔন্স আর গুড়ারুত মাঙ্গানেসের কালা অক্সিদের ৩ ঔন্স হামানদিস্তাতে গুড়া করিয়া, তাহা রিটোর্টের মধ্যে রাখিয়া ও জলের ৪ ঔন্সে মিশ্রিত গান্ধকিকাম্লের ৪ ঔন্স ঠাণ্ডা হইলে তাহার উপর ঢালিয়া, সে সকল অল্পে অল্পে উত্তপ্ত কর তাহাতে খোরিণ আকাশ নির্গত হইবে।"

ভাষারীতির আদর্শ ছাড়াও পরিভাষা সম্পর্কে ম্যাক্ সাহেব এ বই-এ উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করে গেছেন। রসায়ন ইত্যাদি শাস্ত্র যা মূলত আধুনিক ইওরোপের দান, তা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথম অন্তর্বিধাই এখানে যে বিদেশী ভাষাগত কিছু শব্দ ব্যবহার আমাদের পক্ষে অনিবার্য। অথচ সবক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ অসম্ভব তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে তা উপযুক্ত অর্থের দাবিও মেটাতে পারবে না। কাজেই পরিভাষা সংকলনের অন্যতম প্রধান আদর্শই হল এই যে বিদেশী ভাষার শব্দাবলি অনুবাদ হোক, প্রত্যয়ান্তর হোক, অক্ষরান্তর হোক তাকে বাংলাভাষার স্বভাবধর্মের সংগে মিল খাইয়ে নিতেই হবে। ম্যাক্ সাহেবের ভাষায় "In composing this volume, my primary object has been to introduce chemistry into the range of Bengalee literature, and domesticate its terms and ideas in this language." 'domesticate' শব্দটি লক্ষণীয়। আদর্শের ব্যাপারে মোটামুটি একটা স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করলেও গ্রন্থকার পরিভাষা নির্মাণের কাজে খুব বেশিদূর এগোতে পারেন নি। তাঁর নিজের ভাষায় "I have preferred,···, expressing the European terms in Bengalee characters, merely changing the prefixes and terminology, so as decently to incorporat the new words into the language." ম্যাক্ সাহেব প্রদর্শিত এই আদর্শ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত 'সরল রসায়ন' হইতে মোটামুটি অপরিবর্তিত ভাবে অনুসৃত হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র সাধারণত অনুবাদ পছন্দ করতেন না। নিতান্ত প্রয়োজন হলে তিনি সরাসরি সংস্কৃত থেকে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন।

পরিভাষা সংকলন নিয়ে ময়চৈতন্যে চিন্তার পরিচয় পাই আমরা বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিৎ

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনায়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে A Scheme for Rendering of European Scientific terms into the Vernaculars of India নামে প্যাকার স্পিংক এ্যাণ্ড কোং থেকে তাঁর একটি ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় তিনি স্পষ্ট করেই লিপিবদ্ধ করেন কোন কোন ধরণের পারিভাষিক শব্দ অনুবাদ করা উচিত আর কোন ধরণের শব্দের বেলাতে অক্ষরান্তরই যথেষ্ট। যে সব শব্দাবলি রাজেন্দ্রলালের মতে অনুবাদ করা উচিত নয় তা হল :

১. Scientific crude names, such as quinine, bromine etc.
২. Scientific double names of plants and animals.
৩. Foreign names of Inistruments.

যে সব বৈজ্ঞানিক শব্দের অর্থ শব্দে ব্যবহৃত ধাতুর অর্থ থেকে নির্নীত হয় রাজেন্দ্রলালের মতে কেবল সেই সব শব্দই অনুবাদ করা উচিত। এই আদর্শ বেশ যুক্তিগ্রাহ্য। বিশ্বজনীনতা পারিভাষিক শব্দের অবশ্যই একটা লক্ষ্য। বিজ্ঞান মূলত দেশকালাতিবেকী। তাই তার ভাষা যতদূর সম্ভব সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া উচিত। কাজেই নামবাচক শব্দ অনুবাদ না হওয়াই এক হিসেবে বাঞ্ছনীয়।

উনিশ শতকের এইসব চেষ্টার পটভূমিকায় এর পরে যে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছিল তার মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের। খুব সঙ্গতভাবে পরিষদ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পরিভাষার দিকে মনোযোগী ছিল। বাংলা সাহিত্য ও ভাষাচর্চার অঙ্গ হিসেবে পরিষদের আনুকূল্যে ভাষাবিজ্ঞান সমিতি, পরিভাষা সমিতি ও শব্দ সমিতি নামে তিনটি সমিতি তৈরি হয়। পরে ১৩১৩ সালে তিনটি সমিতিকে মিশিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সমিতিতে পরিণত করা হয়। এই সমিতির তরফে এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার মারফত যাঁরা পরিভাষা সংকলন কিংবা সংকলন বিষয়ে রীতিনীতি নির্ধারণে কার্যকর অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রজনীকান্ত গুপ্ত, রাজেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায়, হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, হারাণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, অপূর্ব চন্দ্র দত্ত, একেন্দ্রনাথ ঘোষাল, দুর্গানারায়ণ সেন, শশধর রায় প্রমুখ সেকালের অনেক মনীষী বিদ্বজ্জন। এঁদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন বিদ্যার ক্ষেত্র থেকে নানা পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ ও অনুবাদ করেন। এই সব সংকলন কর্মে যে সব বিষয় থেকে শব্দ চয়ন করা হয়েছিল তাদের মধ্যে আমরা পাই গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শরীরবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জ্ঞায়, জ্যোতিষ, অস্থিবিদ্যা ইত্যাদি। বিভিন্ন সংকলন বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করেছিলেন, বিভিন্ন রীতিপদ্ধতি ছিল তাঁদের আদর্শ; এমনকি অনেকে হয়ত পদ্ধতিগত প্রশ্নে খুব চিন্তিতও ছিলেন না। তবুও তাঁদের এই অনলস অধ্যবসায় যা ছিল প্রায় অহেতুক, কারণ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা তখন কোন বাস্তব প্রস্তাব ছিল না, আমাদের কাছে অবশ্য স্মরণযোগ্য।

পরিভাষা নির্মাণে আদর্শ নির্ণয় নিয়ে যাঁরা বিশেষভাবে ভাবিত ছিলেন রাজেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। এ বিষয়ে তাঁর প্রতিভা ছিল প্রয়োজনীয় গুণাবলির এক বিরল সমন্বয়। নিজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক, তাঁর মনোযোগের সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ অধিকার করেছিল বিজ্ঞানের সাধনা, বা তার চেয়েও বেশি, বিজ্ঞানের প্রচার। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক একাধিক বই ও প্রবন্ধের তিনি রচয়িতা। আবার বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর কৌতূহল ছিল

স্বাভাবিক ও অবিরল। সে বিষয়ে তাঁর অধিকার ছিল সংশয়াতীত। সাহিত্য পরিষদেরও জন্মলগ্ন থেকে তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা। কাজেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্মাণে এক বড় দায়ভার তাঁকেই বহন করতে হয়েছিল। এ বিষয়ে তাঁর কীর্তিও স্থায়িত্বের দাবি রাখে।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কি আসলে নির্মিত হওয়া উচিত? এ প্রশ্নে রাজেন্দ্রসুন্দরের জবাব তাঁর ভাষাতেই উদ্ধার করছি:

'জ্ঞানের ভাষা বা পরিভাষা গঠনের সময় এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে। যে শব্দটি উচ্চারণ করিবে, তাহার যেন একটি নির্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি, সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট, হেঁয়ালিত্বহীন অর্থ থাকে। একটি নির্দিষ্ট শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে, সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করিবে না, এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের সৃষ্টি করিবে না, এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূল সূত্র।' এই অনুশাসন হয়ত ঈষৎ তীব্র। 'বাঁধাবাঁধি,' 'সীমাবদ্ধ,' 'স্পষ্ট,' 'হেঁয়ালীত্বহীন', প্রভৃতি বিশেষণের সাহায্যে তিনি যে আদর্শকে উচু করে তুলতে চেয়েছেন তা নিশ্চয়ই অনুস্মরণযোগ্য, যদিও তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সবসময়ে সহজসাধ্য নাও হতে পারে। কোন কোন শব্দ আদৌ অনুবাদের প্রয়োজন নেই? এই প্রশ্নে রাজেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক উদারপন্থী ছিল। এবং এ বিষয়ে তাঁর চিন্তা অনেকক্ষেত্রেই যেন আধুনিক মননকে স্পর্শ করে যায়। বাংলা করতে হবে বলেই সর্বত্র নির্বিচারে ইংরেজি অথবা অন্যান্য বিদেশী শব্দের আড়ষ্ট অনুবাদের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। ইংরেজি শব্দ অনুবাদ বা রূপান্তর ছাড়াই কতদূর গ্রহণযোগ্য তাঁর মতে তা প্রথম বিবেচ্য। এমনকি তিনি কতদূর পর্যন্তও যেতে প্রস্তুত যে যদি সব শব্দের বেলাতেই এই নীতি প্রযোজ্য হত তাহলে পরিভাষা প্রণয়নে তিনি আদৌ উৎসাহ নিতেন না। তবে অবশ্যই বিনা অনুবাদে সব শব্দ গ্রাহ্য নয়। কাজেই পরিভাষা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা। এ বিষয়ে কিন্তু রাজেন্দ্রসুন্দর স্পষ্ট মত পোষণ করতেন যে রসায়ণ, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে এমন অনেক ইংরেজি শব্দ আছে যা 'অকাতরে অবিকলভাবে' নিতে হবে আমাদের। যেমন, তিনি মনে করতেন যে রসায়ন শাস্ত্রের অন্তর্গত একটি মূল পদার্থের জন্য আটষট্টিটা খাঁটি বাংলা শব্দ সংগ্রহের পণ্ডশ্রম বিড়ম্বনা মাত্র।

বিজ্ঞান কেবলমাত্র পণ্ডিতজনগ্রাহ্য এক উচ্চমার্গের জ্ঞানের বিষয় হয়ে থাকবে তা রাজেন্দ্রসুন্দরের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি খুব জোরের সঙ্গেই বিশ্বাস করতেন যে সার্বিক মঙ্গলের জন্য বিজ্ঞানের চর্চা বিজ্ঞানী সমাজকে ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। বিজ্ঞানের এই লোকায়তিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যা প্রয়োজন তা হল পারিভাষিক শব্দের বাহুল্য বর্জন। ইংরেজিতে এমন অনেক শব্দ আছে যা চলতি ভাষার শব্দ বটে, তবে বিজ্ঞানের প্রয়োজনে সেই সব শব্দ অবিকৃতভাবে পারিভাষিক অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, Mass, force, stress, strain, step, spin, turist, shear, torque, whirl, pressure, tension, flux, power প্রভৃতি। সম্ভবমত বাংলাতেও এমনি চলতি ভাষার শব্দ পারিভাষিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা সঙ্গত। উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন Mass—জিনিস, lens—পরকলা, prism—কলম wind—হাওয়া, work—কাজ, tension—টান, spestrum—ছটা ইত্যাদি।

শব্দ নির্মাণের বেলায় ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তি গত খুঁটিনাটি নিয়ে অনেকের খুঁতখুঁতি প্রায়

হাস্যকর পর্যায়ে পৌছয়। প্রধানত এঁদের 'শুদ্ধির তাণ্ডবে' বিপর্যস্ত হবার আশংকায় রাজেন্দ্রসুন্দর নির্দেশ রেখে গেছেন যে পরিভাষা নির্মাণে বিজ্ঞান অর্থাৎ বিষয়ই মূল লক্ষ্য। বিজ্ঞানের খাতিরে ব্যাকরণের ঈষৎ ত্রুটি সেখানে মার্জনীয় 'সুবিধা, সরলতা, শ্রুতিসুখতা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্যাকরণ বা ব্যুৎপত্তির খুঁটিনাটি ত্যাগ করিয়া একটু সাহসের সহিত চলিতে হইবে, মূল কথাটা এই।" পরিভাষা নির্মাণে এই সাহস কতদূর যেতে পারে বা যাওয়া উচিত সে বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন আইরিশ অধ্যাপক ফিট্জ গেরাল্ড্ প্রবর্তিত পরিভাষার। অধ্যাপক ফিট্জ গেরাল্ড অলিবার হেবিসাইড প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে diffusin—diffusance—diffusurity, expausion—expausance—expausivity, gravitation—gravitance—gravitivity, heat—heatance—heativity পর্যন্ত ব্যবহারে দ্বিধা করেন নি।১ অধ্যাপক জোরের সঙ্গেই মনে করেন যে যথাপরিচয়ে এইসব ব্যবহার একদিন আর আড়ষ্ট বলে মনে হবে না; তা বৈজ্ঞানিক ভাষার সহজ আত্মীয় হয়ে গড়ে উঠবে।

পরিভাষার আদর্শ নিয়ে রাজেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে যোগেশচন্দ্র রায়ের বেশ মতপার্থক্য ছিল। সাধারণভাবে যোগেশচন্দ্রের মনের ঝোঁক অনুবাদ বিমুখ। তিনি মূলত বৈজ্ঞানিক নামের জন্য সংস্কৃত শব্দ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিতে সাধারণের বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান ও হল দু'জাতের রচনা—তাই তার ভাষারীতিও ভিন্ন। বিজ্ঞানীর জন্য বিজ্ঞান রচনায় অনেক বেশি পরিমাণে পারিভাষিক শব্দ হয়ত ব্যবহৃত হবে, স্পষ্ট এবং নিশ্চিত অর্থ ই সেখানে প্রধান লক্ষ্য, আর সাধারণ মানুষের জন্য যে বৈজ্ঞানিক রচনা সেখানে সরলতা মূল আদর্শ। বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিকৃতি বাঁচিয়ে যতদূর সম্ভব সহজবোধ্য করে প্রকাশ করতে পারাই সেখানে রচনার লক্ষ্য। কজেই সেই জাতের রচনায় পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারই কম। এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই রাজেন্দ্রসুন্দরের কাছে পারিভাষিক শব্দের সরলতা খুব জরুরি আদর্শ নয়। যোগেশচন্দ্রের কাছে অবশ্য এই দ্বিস্তর বিজ্ঞান রচনার আদর্শ একেবারেই গ্রাহ্য নয়। একাধিক প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁর ধারণা তিনি স্পষ্ট প্রকাশ করেছেন। যোগেশচন্দ্রের মতে সব বিজ্ঞানেই সকলের অধিকার থাকা প্রয়োজন। অতএব পরিভাষা যতদূর সম্ভব দেশজ হওয়া উচিত এবং তার সরলতা সম্পাদনও আমাদের অবশ্য কর্তব্য। লোক-সাধারণের জন্য বিজ্ঞান এই প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র অধ্যাপক ক্রলের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন। দেশজ ভাষার ব্যাপারে ক্রলের মতামত বেশ প্রগতিশীল। পরিভাষা নির্মাণে তাঁর যা আদর্শ তা হল:

১. To utilize words already in use either in existing books or with educated native gentlemen like Kabirajas, provided they are pure Bengali.

২. Not to reject terms in actual use among the peasants for the simple reason that the so-called educated people do not undestand them; because after all, every one, high or low, is an authority in the subject or occupation with which he is practically acquaint d or which he practises.

পরিভাষা রচনার সময় প্রয়োজনমত সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করা এই ছিল যোগেশচন্দ্রের নির্দেশ। এর পিছনে তাঁর যে যুক্তি ছিল তা হল বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, ওড়িয়া ইত্যাদি বিভিন্ন

ভারতীয় ভাষায় এর ফলে পরিভাষা কিছুটা কাছাকাছি আসতে পারে এবং বিজ্ঞানের ভাষায় আঞ্চলিকতার পরিবর্তে এক ভারতীয় রূপ অন্তত কিছুটা গড়ে উঠতে পারে। অধ্যাপক ব্রুলের মনোভঙ্গি কিন্তু এ ব্যাপারে ভিন্ন। তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে জনমনের প্রত্যক্ষ সংযোগে বিশ্বাসী। তাই এমন কি সংস্কৃত শব্দেরও বহুলতায় তাঁর কুণ্ঠা। তাঁর স্পষ্ট ঝোঁক "to utilize provincial terms, if they are short and to the point, especially if they are understood by the common people near large centres of education. It is certainly easier for a Bengali child to learn the meaning at a simple Bengali sounding word and to remember it than to absorb into his vocabulary a probably langer and stranger sounding Sanskrit term."

বাংলা ভাষায় পরিভাষা সংকলন কর্ম রবীন্দ্রনাথের কাছেও গভীরভাবে ঋণী। তিনি আজীবন রচনার মধ্যে প্রয়োজনমত বহু পরিভাষা সৃষ্টি করে অথবা অনুবাদ করে নিজের কাজে লাগিয়ে ছিলেন। তাঁর সেই বিপুল রচনা সম্ভার থেকে যত্ন করে আহরণ করা এমনি কিছু রবীন্দ্রব্যবহৃত শব্দতালিকা আমরা পাচ্ছি শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও শ্রীদমীরকান্ত গুপ্তের রচনায়। বিশেষ করে বীরেন্দ্রনাথ তাঁর 'রবীন্দ্র শব্দকোষ' নামের বই-এ। এক অত্যন্ত মূল্যবান কাজ করেছেন বহু পরিশ্রম ও নিষ্ঠায়। এ বিষয়ে তিনি এর আগেও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই রবীন্দ্র গবেষণায় আমরা জানতে পারি কি প্রচুর পরিমাণে নতুন শব্দ রবীন্দ্রনাথ উদ্ভাবন করেছিলেন এবং তার মধ্যে এমন অনেক শব্দ ছিল যা অনায়াসে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার কাজে ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে আধুনিক মনস্তত্ত্ব, দর্শন ও সমাজবিদ্যার বিভিন্ন অংশের নানা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত শব্দের সাহায্যে অনেকদূরই মিটতে পারবে। ইতস্তত কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি: autonomous—স্বতঃশাসিত, baptism—অগ্নদীক্ষা, bigamy—দ্বৈধব্য, bourgeoisie—পরশ্রমজীবী, champiom (of a cause)—ক্রপতি, collectivition—ঐকত্রিকতা, corona—কিরীটিকা, diarchy—দ্বৈরাজ্য, disconnected—অসংসক্ত, energy—প্রৈতি, forced labour—অগত্যা প্রেরিত খাটুনি, foster son—কৃতক পুত্র, collective granary—ধর্মগোলা, have-nots—কমিকেরা, iguition—আগ্নেয়তা, infra-red light—লাল-উজানি আলো, islanders—দ্বৈপায়ন-গণ, labour saving machine—মিতশ্রমিক যন্ত্র, martial race—যোদ্ধজাতি, mesmerism—সম্মোহন, monogamy—অদ্বয় বিবাহ, natural selection—প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ব প্রভৃতি।

পরিভাষা নিয়ে চিন্তাচর্চা আধুনিক কালেও একেবারে থেমে নেই। ১৩৬৪ সালের বিশ্বভারতী পত্রিকায় শ্রীপুণ্যশ্লোক রায় এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। শ্রীযুক্ত রায়ের আলোচ্য বিষয়ই ছিল পরিভাষা সংকলনের রীতিনীতি। পরিভাষা কি ভাবে পাব? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি তিনটি সূত্র নির্দেশ করেছেন: (১) ঋণ (২) ঋণ-অনুবাদ আর (৩) নির্মাণ। চেয়ার, টেবিল এই জাতীয় বিদেশী জিনিস যেমন আমাদের জীবনে এসেছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব শব্দগুলিও আমাদের ভাষার অঙ্গীভূত হয়েছে। অতএব আশা করবার কারণ আছে, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা

যতই আমাদের শিক্ষার সহজ অঙ্গ হয়ে উঠবে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যতই তার অনুপ্রবেশ বাড়বে ততই সেইসব চিন্তা ভাবনা সংপৃক্ত শব্দও আমাদের ভাষায় আপন জায়গা করে নেবে। এ নিশ্চয়ই ঋণ গ্রহণ, তবে তা কালক্রমে আত্মস্থ হয়ে যাবে। ঋণ—অনুবাদ বলতে বোঝায় 'পুরণো অপ্রচলিত অর্থবিস্মৃত শব্দ খুঁজে এনে তাই দিয়ে নতুন চেনা নতুন জানা ব্যাপারের একরকম নামকরণ করা।' এই প্রক্রিয়ায় পুরনো শব্দ দিয়ে, বা তা ভেঙ্গে চুরে নতুনের কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। 'বিজ্ঞান', 'ইতিহাস', 'পদার্থ' প্রভৃতি খুব চেনাজানা শব্দ এ ধরনেরই। আর শব্দ নির্মাণের বেলাতে খেয়াল রাখতে হবে যে নির্মিত শব্দ যেন বাংলা ভাষার স্বাভাবিক নিয়ম ও রীতির পথ ধরেই আসে। প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব স্বভাবধর্ম আছে, ইংরেজিতে যাকে বলে genius। সেই স্বভাবধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারলেই তবে নতুন শব্দ ভাষায় একেবারে মিশে যেতে পারবে।

পরিভাষার ব্যাপারে আধুনিক চিন্তা শব্দের কুলশীল বিচারেও অনেক সহিষ্ণু। ব্যাকরণের নিয়মে রাজযোটক না হলেও চলবে, যদি তা চিন্তার সঠিক বাহন হতে পারে। এবং এ বিষয়ে যতদূর সম্ভব বহুজনের মুখে মুখে ফেরা শব্দ, প্রয়োজনমত ঝাড়ামোছা করে ব্যবহার করাই সঙ্গত। 'মুন্সেফ'কে 'ন্যায়াধীশ', কিংবা 'পুলিশ'কে 'আরক্ষা', 'ডেপুটি কালেকটার'কে 'সমাহর্তা', 'এনফোরসমেণ্ট ব্রাঞ্চ'কে 'নির্বহণ শাখা' বললে ইংরেজির ছোঁয়াচ বাঁচান গেল এই লাভ ছাড়া আর কিছু লাভ হচ্ছে কি?

সংযোজন

'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' ও 'অন্যান্য' এই দুই অংশে ভাগ করে পরিভাষা সংকলন ও সে বিষয়ে প্রবন্ধাদির একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল। দুই তালিকাই অসম্পূর্ণ।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' (কার্তিক, ১৩০১) ২। অপূর্বচন্দ্র দত্ত—'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' (মাঘ, ১৩০১) ৩। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—'উপস্থিত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা লেখকের বক্তব্য' (মাঘ, ১৩০১) ৪। মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' (বৈশাখ, ১৩০২) ৫। অপূর্বচন্দ্র দত্ত—'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' (বৈশাখ, ১৩০২) ৬। যোগেশচন্দ্র রায়—'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' (শ্রাবণ, ১৩০২) ৭। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' (শ্রাবণ, ১৩০২) ৮। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—'বাঙ্গালায় আদি রসায়ন গ্রন্থ' (১৩০৫) ৯। হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'জ্যোতিষিক পরিভাষা' (১৩০৬) ১০। যোগেশচন্দ্র রায়—'ভৌগোলিক পরিভাষা' (১৩০৭) ১১। যোগেশচন্দ্র রায়—'জীববিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা' (১৩১০)

১। হেবিসাইড প্রদর্শিত রীতি রামেন্দ্রসুন্দর নিচের উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন:

Conduction = phenomenon of conduction of electricity অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনা বিশেষ, তাড়িত পরিচালন ব্যাপার। Conductance = amount of electricity conducted অর্থাৎ পরিচালিত তাড়িতের পরিমাণ। Conductivity = coefficient of conduction অর্থাৎ পদার্থ বিশেষের পরিচালন শক্তি।

১২। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—'উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক পরিভাষা' (১৩১০) ১৩। বিরজাচরণ গুপ্ত—'জীববিজ্ঞান পরিভাষা' (১৩১১) ১৪। হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত—'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' (১৩১৩) ১৫। দুর্গানারায়ণ সেন—'আয়ুর্বেদের অস্থি-বিদ্যা (১৩১৪) ১৬। শশধর রায়—'জীববিজ্ঞানের পরিভাষা' (১৩১৪) ১৭। দুর্গানারায়ণ সেন—'আয়ুর্বেদের অস্থিবিদ্যা (দ্বিতীয় প্রস্তাব)' (১৩১৫) ১৮। হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত—'খনিজবিদ্যার পরিভাষা' (১৩১৫) ১৯। একেন্দ্রনাথ দাসঘোষ—'উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক পরিভাষা' (১৩১৭) ২০। শশধর রায়—'বর্ণতত্ত্বের পরিভাষা' (১৩১৭) ২১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—'শরীরবিজ্ঞান পরিভাষা' (১৩১৭) ২২। শশধর রায়—'জীববিজ্ঞানের পরিভাষা (১৩১৭) ২৩। একেন্দ্রনাথ ঘোষ—'নিদানোক্ত কতকগুলি আয়ুর্বেদীয় শব্দের পরিভাষা' (১৩১৮) ২৪। হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'গণিত পরিভাষা' (১৩২০) ২৫। বনমালি বেদান্ততীর্থ—'তর্কের পরিভাষা' (১৩২০) ২৬। সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা' (১৩২০) ২৭। হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত—'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' (১৩২১) ২৫। রাখালরাজ রায়—'রেশন শিল্পের পারিভাষিক শব্দ' (১২২৩) ২৯। অম্বুজাক্ষ সরকার—'Per cent-এর প্রতিশব্দ' (১৩২৩) ৩০। বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—'রবীন্দ্রনাথ কৃত ইংরাজি শব্দের বঙ্গানুবাদ' (১৩৭১)

অন্যান্য

১। প্রফুল্লচন্দ্র রায়—প্রদীপ (কার্ত্তিক, ১৩০৪) ২। যোগেশচন্দ্র রায়—রত্নপরীক্ষা ৩। সুধীরকুমার চৌধুরী—'সরকারী পরিভাষা' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৫৪-৫৫) ৪। —'বাঙলা-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি' (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২৬) ৫। সমীরকান্ত গুপ্ত—'শব্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৪শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২৬) ৬। পুণ্যশ্লোক রায়—'বাঙলার পরিভাষা সংকলনের রীতিনীতি' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৪শ বর্ষ, ১৩৬৪-৬৫) ৭। অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত—ভারতী (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০) ৮। অক্ষয়কুমার দত্ত—পদার্থবিদ্যা ৯। নবীনচন্দ্র দত্ত—খগোল বিবরণ ১০। Rajendralal Mitra—A scheme for Rendering of European Scientific termes into the vernaculars of India (Thacker Spinck & co., 1877)
১১। বুদ্ধদেব বসু—'সমালোচনার পরিভাষা' (কবিতা, আশ্বিন, ১৩৫৫)

একটি অপ্রচলিত মঙ্গলকাব্য

ত্রিপুরা বসু

খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত যুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হোল মঙ্গলকাব্য। এ কাব্যের দেবদেবীরা অনেকেই আর্য-পরিমণ্ডল বহির্ভূত। লৌকিক ও অপৌরাণিক গ্রাম্য আদর্শ থেকে উদ্ভূত এই সব দেবদেবী প্রথম যুগে আর্য্যেতর সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যাপকভাবে পূজিত হলেও পরবর্তীকালে বাংলাদেশে আর্যধর্ম প্রচার লাভ করলেও প্রাচীন বাঙালী তাদের পুরোনো সংস্কার কিছু কিছু করে বিস্মৃত হতে শুরু করে। কিন্তু পুরোনো সেই দেবদেবীরা অনেকেই স্বস্থানে বহাল তবিয়তে থাকলেন। বিশেষ করে স্ত্রী সমাজে ও সমাজের নিম্নস্তরে, যেখানে আর্যধর্মের প্রসার সম্ভব হোলো না, সেখানে এই অনার্য দেবদেবীদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। চণ্ডী, মনসা, বাশুলী, ধর্ম, পঞ্চানন, শীতলা, সুবচনী, ষষ্ঠী ইত্যাদি এজাতীয় দেবদেবীরা প্রাচীন বাঙালীর আর্যেতর সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

দেবদেবীদের মহিমামুলক আখ্যানকাব্য 'মঙ্গলকাব্য' যে ঠিক কোন সময় থেকে রচিত হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত তা স্থিরীকৃত হয়নি। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরানের'* চণ্ডীস্তোত্রের কয়েকটি শ্লোকে 'চণ্ডীমঙ্গলের' কালকেতু ফুল্লরা ও ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানের অংশবিশেষ বিধৃত হয়েছে বলে এই শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবযুগ (Age of origin) বলা যেতে পারে। এই হিসাবে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যকে বাংলার সর্বপ্রাচীন মঙ্গলকাব্য বলা, এক হিসেবে সার্থক।

খ্রী: পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কবি বিজয় গুপ্ত নিজ কাব্যে তাঁর পূর্ববর্তী কবি কানা হরিদত্তের নাম উল্লেখ করেছেন। ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কবি মুকুন্দরাম তাঁর পূর্ববর্তী কবি মানিক দত্তের নাম উল্লেখ করেছেন। 'ধর্মমঙ্গলের' কবি ঘনরামও পূর্ববর্তী কবি ময়ূরভট্টের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। পূর্ববর্তী ঐ কবিগণ সকলেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলে অনুমিত হন। পরবর্তী ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে আবির্ভূত বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশীদাস, দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম, মানিক গাঙ্গুলী, প্রভৃতি কবিগণের হাতে মঙ্গলকাব্যগুলি পরিপূর্ণরূপ লাভ করে।

---

*The Brihad dharma purana—A thirteenth century work of Bengal—R. c. Hazra, 1955. (Vide the gournal of the university of Gouhati Vol. IV 1955) :—

"ত্বং কালকেতু বরদা চ্ছলগোধিকাশি।
যা ত্বং শুভা ভবশি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা ॥
শ্রী শালবাহন নৃপাদ্ বনিজঃ সসূনো।
রক্ষেহম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী ॥"

তবে অষ্টাদশ শতাব্দী মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যের যুগ। এ যুগে আবির্ভূত 'শিবমঙ্গলের' কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য, 'ধর্মমঙ্গলের' কবি ঘনরাম চক্রবর্তী, 'অন্নদামঙ্গলের' কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও কবি রামপ্রসাদ সেন মঙ্গলকাব্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার। কিন্তু বাংলাসাহিত্যের এ স্বর্ণযুগপ্রবাহ বেশীদিন অব্যাহত থাকেনি। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাঙালীর পরাজয় ও ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গলকাব্যধারার সর্বশেষ (?) কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাঙালীর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই বিশৃংখলাজনক পরিস্থিতি* স্বাভাবিক হতে শতাধিক বৎসর ব্যয়িত হলেও বাঙালীর স্থৈর্য তখন এক যান্ত্রিকতার মধ্যে ঘন সন্নিবদ্ধ। পাশ্চাত্য প্রভাবে আত্মবিস্মৃত জাতি নব্যসভ্যতার আলোকে ধীরে ধীরে অবগাহন শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই বৃহদায়তনের 'মঙ্গলকাব্য' গুলির রচনা চিরতরে স্তব্ধ হয়ে রচিত হতে শুরু করেছে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের মঙ্গলকাব্যগুলি—প্রাচীন সাহিত্যের কট্টর সমালোচকদের অনেকে যেগুলিকে পরম নাসিকাকুঞ্চিত করে 'পাঁচালী' বিশেষণে বিশেষিত করতে একান্ত আগ্রহী। শীতলা, পঞ্চানন, সত্যপীর, সুবচনী, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবদেবীরা যারা এতদিন কাব্যে অবজ্ঞাত ছিলেন—এবার তাঁরাই পল্লীর অখ্যাত কবিদের কাব্যের নায়ক নায়িকা হয়ে ও গ্রামের গাছতলা থেকে সুরম্য মন্দিরে স্থান লাভ করে যেন কৌলিন্য লাভ করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অখ্যাত কবির সুনিপুণ বর্ণনাচাতুর্যে রসসঞ্চারী, নানাভাবে আঞ্চলিকতায় বিশিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এ জাতীয় মঙ্গলকাব্যগুলি নানাকারণে ব্যাপক বিস্তৃতিলাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়। এ জাতীয় কবিদের সম্যক হিসাব এখনো অপরিজ্ঞাত।

এমনি একটি অপ্রচলিত মঙ্গলকাব্য 'শুভদামঙ্গল' বা 'সুবচনী মঙ্গল।' এ কাব্যের কয়েকজন কবি দ্বিজমাধব, দ্বিজরামজীবন, মাধবদাস—এঁদের রচিত কাব্যের কয়েকখানি খণ্ডিত ও সম্পূর্ণ পুঁথি মেদিনীপুর হুগলীজেলার গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। প্রচলিত মুদ্রিত গ্রন্থে দেবী সুবচনীর ধ্যান নিম্নরূপ :**

'ওঁ রক্তাঙ্গী চ চতুর্মুখী ত্রিনয়না রক্তাম্বরালঙ্কৃতা।
পীনোত্তুঙ্গকুচা দুকূলসনা হংসাধিরূঢ়া পরা॥
ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলবরাভীতি প্রদানোৎসুকা।
ধোয়া সা শুভকারিণী সুবচনী সর্বাপদুদ্ধারিণী॥'

হিন্দু গৃহস্থের গৃহে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি শুভ কার্যের পূর্বে বা পরে পরিবারের নিত্যশুভকামনায় এই দেবীর পূজা করা হয়। গৃহের পরিচ্ছন্ন উঠানে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিনী সদৃশ গর্ত খনন করে তা দুধ দ্বারা পূর্ণ করা হয়। প্রস্তর নির্মিত একটি নোড়া যে কোন একটি সোনার অলংকার দিয়ে সেই পুষ্করিনী মধ্যে স্থাপন করে যথারীতি পূজাদি করা হয়। দেবীর বাহন স্বরূপ কলার ২০টি নিখুঁত হাঁস ও একটি খোঁড়া হাস দেবীর চতুষ্পার্শ্বে স্থানলাভ করে। পাঁচ, সাঁত বা

* সমকালীন ২০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা পৃঃ ১০৪
** পুরোহিত দর্পণ, ৫ম খণ্ড পৃঃ ৮২২

নয়জন এয়োস্ত্রীকে আহ্বান করে গৃহস্থ তাদের রীতিমত আদর আপ্যায়ন করে। পূজা অন্তে দেব সুবচনীর মাহাত্ম্যকথামূলক এই কাব্যখানির সংক্ষিপ্ত আকার ব্রাহ্মণ পাঠ করে শোনান। মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার কোন কোন অংশে ব্যাপক সুবচনী পূজো হতে দেখা যায়।

কবি মাধব রচিত 'শুভদামঙ্গলের' তুলট কাগজের দুটি পুঁথি পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে একটি তিনপৃষ্ঠার। একটি মাত্র ভনিতায় কাব্য সম্পূর্ণ। ভনিতাটি নিম্নরূপ :—

'শুভবচনির পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
রচিল মাধব দ্বিজ অপূর্ব কথন॥'

এছাড়া কবি সন্দেহনিরসনকল্পে আর কিছুই লেখেন নি—ইতিহাস নির্মাণে যা বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারে। পুষ্পিকা অংশে লিপিকরের নাম বা সাল তারিখ না থাকায় কেউ একে কবির স্বহস্তলিখিত পুঁথি বলেও বলতে পারেন।

অপর পুঁথিটি ৮টি জোড়া তুলটের। কবি নিজে এটিকে 'সুবচনি মঙ্গল' বলেছেন। একাব্যের বিভিন্ন ভণিতাগুলি নিম্নরূপ :—

(১) সুবচনির চরণ ভাবিয়া অনুঘন।
পাচালি পবন্ধে কিছু মাধব বচন॥
(২) সুবচনি পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
রচিল মাধবদাস অপূর্ব কথন॥
(৩) দেবির বচন এই করিল প্রকাশ।
রচিল মাধবলতা কহিলেন ব্যাস॥

একটি ভনিতায় কবি নিজেকে দাস উপাধিতে ভূষিত করেছেন বলে যে তিনি অব্রাহ্মণ ছিলেন এ ধারণা অমূলক। দুটি পুথির বিষয়বস্তু ও পদগুলির মধ্যে সামান্যমাত্র অমিল দেখে মনে হয় একই কবির রচিত দুটি কাব্য ভিন্ন নামে প্রচারিত ছিল। শেষোক্ত পুঁথির পুষ্পিকা পদটি নিম্নরূপ :—

'লিখিতং শ্রীকিঙ্কর দাস পণ্ডা সাং বেলাঘাট সন ১২২৪ সাল তাং ১ অঘ্রাণ এবং এ পুস্তক জে চুরি করিবেন এবং জে মাগি লয়্যা জায় জদি না দেই গো হর্তা ব্রহ্মহর্ত্তার পাপ লাগে।'

কাব্যের ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের ঢং দেখে একে খুব বেশী প্রাচীন বলে মনে হয় না। এমন কি বাংলা সাহিত্যে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যরচয়িতা ও সর্বজনবিদিত যে দ্বিজ মাধব—একাব্যটিকে আদৌ তাঁর রচনা বলে বলা চলে না।

উক্ত কাব্যদুটিতে 'শুভদামঙ্গলের' কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—অপুত্রক এক ব্রাহ্মণ দেবী সুবচনীর বরে একটি পুত্রসন্তান লাভ করে। কিন্তু পুত্রমুখ দর্শনে ব্রাহ্মণের মৃত্যু দেবী কর্তৃক স্থিরকৃত হওয়ার অকালে ব্রাহ্মণকে প্রাণত্যাগ করতে হয়। অসহায় ব্রাহ্মণী অতিকষ্টে সন্তানকে লালন পালন করে বড় করে। একদা ভুলক্রমে দেবী সুবচনীর অন্যতম বাহন একটি খোঁড়া হাসকে বধ করে ব্রাহ্মণপুত্র ভক্ষণ করে। ফলে রাজরোষে পতিত হয়ে তার প্রাণদণ্ড হয়, তখন ব্রাহ্মণীর আকুল প্রার্থনায় দেবী সুবচনী তার পুত্রের প্রাণরক্ষা করেন ও দেবীর আদেশে রাজা নিজকন্যার সঙ্গে ব্রাহ্মণপুত্রের বিবাহ দেন। অর্ধেক রাজত্ব যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত হয়। এরপর থেকেই মর্তে দেবী সুবচনীর পূজা

প্রচারিত হয়।

এ পর্যন্ত সন্ধান প্রাপ্ত 'সুভদ্রা মঙ্গল' কাব্যগুলির মধ্যে বোধ করি কবি দ্বিজ শ্রীরামজীবনই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। তাঁর রচিত তুলট কাগজের ২৪ পাতার একটি পুঁথি পাওয়া গেছে। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার আরামবাগ থানান্তর্গত আরাণ্ডী গ্রামে কবির বাস ছিল। কবির পূর্বপুরুষগণ 'ভূরিশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কবি ভণিতায় বলেছেন :—

'আরাণ্ডি গ্রামেতে ধাম শ্রীরামজীবন নাম
ভূরিশ্রিষ্ট উপাধি জাহার।
সুভদ্রা চরণ সেবি রচিল তনয় কবি
এ পুস্তক করহ উদ্ধার ॥'

কবি তাঁর আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন :—

'রাত্রি দিন ভাবি দ্বিজ অন্য নাহি মন।
দ্বিজ পেলারামের পুত্র শ্রীরামজীবন ॥
শিশুকালে জননী মোর সপ্রবাস হৈল।
পিতামহি অতি দুখে পালন করিল ॥
পিতামহির চরণেতে অসংখ্য প্রণতি।
সুবচনির কথা ভেঙে করিলাম পুঁথি ॥'

কাব্যের প্রথমাংশে কবি শ্রীরামজীবন দেবদেবীদের বন্দনা প্রসঙ্গে নিজ বাসভূমির পার্শ্ববর্তী স্থানীয় দেবদেবীর বন্দনা করেছেন পঞ্চমুখে। আরাণ্ডী গ্রামের আঞ্চলিক ইতিহাস নির্মাণে এ পদটি যথেষ্ট মূল্যবান :—

'গণ্ডচণ্ডি মাতা বন্দ গ্রামে উত্তর দিগে।
দলুরায় ধর্ম বন্দ গ্রামে মর্ধভাগে ॥
সান্তিনাথ শিব বন্দ হাথ জোড় করি।
মনসা কুমারি বন্দ জয় বিশহরি ॥
বাড়ির নিকটে বন্দ কালুরায় চরণ।
কালিদমন করে সেখ ঘোড়া আরোহন ॥
কিতলা কুমারি বন্দ হয়্যা সাবধান।
*মান্দারনে কালিমাতা লয় অধিষ্ঠান ॥
বাঁকুড়া রায় বন্দ গ্রামে পশ্চিম দিগে।
স্বরূপ নারান বন্দ সবাকার আগে ॥

---

* আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানান্তর্গত মান্দারন অঞ্চলের কোন গ্রাম নয়। কবির বাসভূমি আরাণ্ডি গ্রামের পার্শ্ববর্তী বলাইচক, ভাণ্ডারহাটি, সাতামাসা, বহুদেদাল, মান্দারন ইত্যাদি গ্রামগুলি অবস্থিত।

নিজ বাটির কালি বন্দ হয়্যা সাবধান।
আমি অতি মূঢ়মতি দিয় দিব্যজ্ঞান ॥
অতপর মোর মাতাপিতা বন্দিলাম।
বন্দিলাম এবে পিতামহির চরণ ॥
মাতামহ পিতামহি করিল পালন।
এক্ষেণে ভরসা যে বিমাতা চরণ ॥'

বন্দনার ক্রমবিস্তৃতি দেখে কবি নিজেই আবার লেখনী সংযত করতে চেয়েছেন। তিনি এরপর বলেছেন—

'বন্দনা বন্দিতে ভাই পুঁথি বেড়ে জায়।
অসংখ্য প্রণাম মোর সুবচনির পায় ॥
পুঁথি করিবলি দ্বিজ রামজীবন ভাবে।
বন্দনা হইল সায় হরি বল সভে ॥'

আরাণ্ডি গ্রামের নানা অঞ্চল ভ্রমণ কালে কবি বর্ণিত দেবদেবীদের অনেকের সন্ধান মিললেও কবি শ্রীরামজীবনের বংশধরদের কোন পরিচয় সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে ঐ গ্রামের বাল পাড়ায় একটি কীর্ত্তনের দলের খোঁজ মিলে। ঐ দল একটা রামেশ্বরের শিবায়ন, দ্বিজ মাধবের 'চণ্ডীমঙ্গল', নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর 'শীতলামঙ্গল' প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে গেয়ে বেড়াতো বলে জানা যায়। কবির নাম ঐ অঞ্চলে অজ্ঞাত নয়। তবে অনেক চেষ্টার পরও আমাদের পক্ষে রামজীবনের কাব্যের আর দ্বিতীয় পুঁথি আমরা পাইনি। হুগলী বা মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ কাব্যের পুঁথি ছড়িয়ে থাকা সম্ভব।

আলোচ্য পুঁথির পুষ্পিকা পদটির উদ্ধৃত দিয়ে আপাততঃ এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানছি :—

'ইতি সুভদ্রামঙ্গল সমাপ্তং···ইতি সন ১২৬৯ সাল তারিখ আষাঢ় রোজ শুক্রবার তিথি পুর্ণিমা পঠনার্থং শ্রীমায়েশচন্দ্র মাজি সাকিম হাটগেছ্যা পং বেতুয়া সামিল নাট বসন্তপুর থানা কল্মীজোড় জেলা মেদিনীপুর ইতি ॥'

বঙ্কিম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

ভক্তি : ভগবদ্গীতা—স্থূল উদ্দেশ্য (ধর্ম্মঃ | ১৩) ॥

গীতায় জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তি—এই তিনটির কথাই আছে। তার মধ্যে ভক্তিকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলা হয়েছে। 'এই জন্য গীতা প্রকৃত পক্ষে ভক্তিশাস্ত্র'। গুরুর এই কথায় শিষ্য সন্দেহ প্রকাশ করেছে। কারণ গীতা কৃষ্ণকর্তৃক কথিত হয়েছে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য। সুতরাং হিংসার সঙ্গে ভক্তির সামঞ্জস্য কোথায়? তখন গুরু বলেছেন—যুদ্ধ সবসময় নিন্দাই নয়। বিশেষ করে আত্মরক্ষা এবং স্বদেশরক্ষার ক্ষেত্রে।

ভক্তি : ভক্তির সাধন (ধর্ম্মঃ | ২০) ॥

গুরু এবং শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে এখানে ভক্তির সাধনপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বরেও ভক্তির মূল কথা হল উপাসনা। উপাসনা দুপ্রকারের—সাকারও নিরাকার। সাকার উপাসনা নিকৃষ্ট। এর দ্বারা মানুষ মনকে ঈশ্বরভক্তিতে নিবিষ্ট করে। কিন্তু যখন তার হৃদয় ভক্তিভাবে আপ্লুত হয়, তখনই নিরাকার ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে।

ভাই ভাই, সমবেত বাঙ্গালিদিগের সভা দেখিয়া (গদ্য পদ্য বা কবিঃ পুঃ) ॥

প্রঃ প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন',চৈত্র ১২৮১, পৃ.৫৬২-৫৬৩।

বাংলাদেশের বর্তমান হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা দেখে কবির মনের দুঃখ এই কবিতায় প্রকাশিত। এখানে কিছুটা ব্যঙ্গপ্রবণতা থাকলেও করুণ ভাবটিই অধিক পরিস্ফুট।

ভারতকলঙ্ক, ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? (বিবিধপ্রবন্ধ ১ম ভাগ) ॥

প্রঃ প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', বৈশাখ ১২৭৯।

'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধ এক অর্থে আমাদের আত্মানুসন্ধান বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে পরাধীনতার বীজ চিরন্তনভাবে বিহিত কেন—এখানে সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন

প্রথম কথা এই—অনেকে বলে থাকেন ভারতবর্ষীয়েরা বাহুবলে অত্যন্ত ক্ষীণ কিন্তু ইতিহাসে একথা যতটা বলা হয়ে থাকে, ততটা সত্য নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস বেশীরভাগই পরজাতির দ্বারা লিখিত। তাই সেখানে আত্মপক্ষ সমর্থনের একটি ভাব আছে। হিন্দুরা যদি ইতিহাস লিখত তাহলে হয়ত এরকম হত না।

তবে হিন্দুরা যে কিছুটা দুর্বল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর কারণ—ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক সম্পদের প্রাচুর্য্য আছে, তাই অধিকাংশ মানুষই অলস। আবার ভারতবর্ষে স্বাতন্ত্র্যবোধ অত্যন্ত প্রবল নয়। তাছাড়া ভারতবর্ষে একজাতীয়ত্ববোধ খুবই কম। এদেশে বিভিন্ন জাতি এসে মিশেছে। ফলে কোন বিদেশীর আক্রমণকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করা হয় নি। তবে শিবাজী এবং রণজিৎ সিংহর মত দু'একজন হিন্দুত্বের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বীরত্বের প্রকাশ দেখিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজদের 'ভারতবর্ষের পরমোপকারী' বলেছেন। কারণ তারা আমাদের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তাকে যেমন জাগিয়ে তুলেছে, তেমনি আমাদের জাতীয়তাবোধেরও উদ্বোধন করেছে।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা, অনুষ্ঠানপত্র (পুঃ অপ্রঃ) ॥

প্রঃ প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', ভাদ্র ১২৭৯।

কেবলমাত্র 'বিজ্ঞানরহস্য' গ্রন্থরচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চার উৎসাহ সীমিত হয়ে যায় নি। এদেশে যাতে বিজ্ঞানচর্চা প্রসারিত হয় তার জন্য শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার যে 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা' গঠনের জন্য অর্থসংগ্রহ করছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাতে সহযোগিতা করেন। এই আবেদনে তিনি দেশবাসীকে অর্থসাহায্য করার কথা বলেছেন। সেইসঙ্গে বিজ্ঞানের ব্যাপকতা ও প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা (বিবিধ প্রঃ—১ম) ॥

প্রঃ প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', ভাদ্র ১২৮০।

'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক চিন্তার প্রভাব এড়িয়ে ভাল-মন্দ বিচারের সার্থক চেষ্টা। যে যুগে ইংরাজশাসনের অধীনে জনমানসে হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছিল, সেই যুগে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের পূর্বতন স্বাধীনতা ও বর্তমান পরাধীনতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। প্রথমেই তিনি বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে বলেছেন—'শাসনকর্তা ভিন্নজাতীয় হইলেই, রাজ্য পরতন্ত্র হইল না'।

তারপর তিনি দেখিয়েছেন যে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের মধ্যে যেরকম পার্থক্য ছিল, বর্তমানে ইংরেজ এবং এদেশীয়দের মধ্যে সে ধরণের পার্থক্য কম। প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি দু'টি সূত্রে মূল প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন। পাছে কেউ মনে করেন যে এই প্রবন্ধে বঙ্কিম ইংরাজের স্বপক্ষে এবং পরাধীনতার প্রতিই অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, তাই তিনি প্রবন্ধের শেষে কিছু কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।

ভালবাসার অত্যাচার (বিবিধ প্রঃ—১ম) ॥

প্রঃ প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', অগ্রহায়ণ ১২৮১।

'ভালবাসার অত্যাচার' প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু নূতন, কিন্তু অন্তর্নিহিত প্রাণবস্তুটি চিরন্তন। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রীতির মন্ত্রটি এখানেও প্রকাশিত।

অত্যাচার বলতে যা বুঝি তা সাধারণতঃ আমরা পরের কাছ থেকেই আশঙ্কা করে থাকি। কিন্তু ভালবাসার মানুষ অর্থাৎ প্রিয়জনও নানাপ্রকারে যে অত্যাচার করতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র সেই জিনিষটিই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

প্রত্যেক মানুষই স্বার্থের সম্পর্কে কমবেশি আবদ্ধ। তাই অত্যন্ত প্রিয়জনের কাছেও স্বার্থের গন্ধ পাওয়া যায়। দশরথ সত্য রক্ষার জন্য রামচন্দ্রকে বনবাসে প্রেরণ করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এটি দশরথের স্বার্থত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত। কিন্তু তিনি যশঃরূপ স্বার্থরক্ষার জন্য কৈকেয়ীর অন্যায়কেও প্রশ্রয় দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বার্থশূন্য ভালবাসার বিস্তার কামনা করেন। তাই তিনি এখানে 'কমলাকান্তের

দপ্তরের' বাক্যাংশ উদ্ধৃত করেছেন—'পরের অনিষ্ট করিও না ; সাধ্যানুসারে পরের মঙ্গল করিও না।'

বঙ্কিমচন্দ্র শেষপর্যন্ত ধর্ম ও প্রেমকে একাসনে বসিয়েছেন।

• ভিক্ষা ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের এই রচনাটির বিবরণ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী'তে দিয়েছেন।

রচনাটি পাঠ করে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয় না। রচনার ধরণটি অনেকটা 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র মত। ভিক্ষাবৃত্তি যে মানবজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাহাই সরস এবং কোথাও কোথাও ব্যঙ্গপূর্ণ বর্ণনা এটি।

ভীম-জরাসন্ধের যুদ্ধ (কৃঃ চঃ ৪ | ৮) ॥

ভীম ও জরাসন্ধের যুদ্ধে কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কে কয়েকটি অসঙ্গতি আছে। তার মধ্যে প্রধান হল, কৃষ্ণকে 'বিষ্ণু' বলে সম্বোধন ও গরুড়ের আগমন ঘটান। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এ দু'টিই হল পরবর্তী কালের কবিদের যোজনা। কারণ মূল মহাভারতে কৃষ্ণকে কোথাও ঈশ্বরের অবতাররূপে বর্ণনা করা হয় নি।

ভীষ্মের যুদ্ধ (কৃঃ চঃ ৬ | ১) ॥

এখানে ভীষ্মবধ প্রসঙ্গে কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য এইপ্রসঙ্গে গীতার কথা বাদ দেওয়া হয়েছে। ভীষ্মের সমকক্ষ যোদ্ধা অর্জুন পিতামহের প্রতি দুর্বলতাবশতঃ ভালভাবে যুদ্ধ না করায় কৃষ্ণ একদিন সুদর্শনচক্র নিয়ে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হলেন। তখন অর্জুন নিজেই ভীষ্মকে বধ করবেন বলে কৃষ্ণকে ফেরালেন। এ ঘটনাটি নিয়ে অনেক তর্ক উপস্থাপিত করেন। কারণ, তাঁদের মতে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করবেন না। অবশ্য এখানে আমরা দেখতে পাই যে কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নিজে ভীষ্মকে নিহত করা নয়, অর্জুনের উত্তেজনা জাগান। 'ভীষ্মপর্বে' নিকৃষ্টস্তরের কবিকর্মের নিদর্শনের কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন।

মথুরা-দ্বারকা (কৃঃ চঃ তয় খণ্ড) ॥

এই শিরোনামযুক্ত তৃতীয় খণ্ডটিতে মোট সাতটি পরিচ্ছেদ আছে। মথুরা এবং দ্বারকার ঘটনাসংশ্লিষ্ট কৃষ্ণচরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনই এই খণ্ডের মূল প্রতিপাদ্য।

মন এবং সুখ (গদ্য পদ্য বা কবিঃ পৃঃ) ॥

প্রঃ প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', কার্তিক, ১২৮০, পৃঃ ৩২৯-৩৩০।

কবি যেন কৃষ্ণভাবে ভাবিত হয়ে রাধার ন্যায় তাঁর প্রতি মন সমর্পন করতে চান। কবিতাটি মধুরভাবাপন্ন।

মনুষ্যফল (কঃ দঃ-২য় সংখ্যা) ॥

'মনুষ্যফল' প্রবন্ধটি ১২৮০, আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

'মনুষ্যফল' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন মানবশ্রেণীকে কয়েকটি ফলের সঙ্গে তুলনা করে হাস্যরস জমিয়ে তুলেছেন। বড় মানুষদের তিনি কাঁঠালের সঙ্গে, সিবিল সার্বিসের সাহেবদের আমের সঙ্গে, স্ত্রীলোকদের নারকেলের সঙ্গে, দেশহিতৈষীদের শিমুলফুলের সঙ্গে, অধ্যাপক ব্রাহ্মণদের ডুমুরফুলের সঙ্গে, লেখকদের তেঁতুলের সঙ্গে, এবং হাকিমদের কুমড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দোষ হাস্যরসের সৃষ্টি বঙ্কিমের উদ্দেশ্য, তবু কোথাও কোথাও

সামাজিক অসঙ্গতির প্রতি তীব্র কটাক্ষ লক্ষ্য করা যায়। সিবিল সার্বিসের সাহেবেরা সেলাম-জল এবং খোশামোদ বরফে যে সন্তুষ্ট হন এটা তার ভালভাবে জানা আছে। ভণ্ড দেশহিতৈষী তথা, বঙ্কিমের বিরক্তি উৎপাদন করেছে। অধ্যাপকদের 'বঠন থুতুরা' অসহ্য। লেখকদের এবং দেশী হাকিমদেরও সমালোচনা করে তিনি আত্মসমালোচনার পথ প্রস্তুত করেছেন।

কেবলমাত্র সমালোচনা নয়, কোথাও কোথাও উপদেশও বর্ষিত হয়েছে। যেমন—সংসারঅভিজ্ঞতাশূন্যা বালিকাকে বিবাহ করা যে ভয়ানক, এবং সেক্ষেত্রে কি করা দরকার, বঙ্কিম তা বলে দিয়েছেন।

'মনুষ্যফল' প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র সস্তা রসিকতা নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মানবদরদী মনটিও প্রকাশিত হয়েছে।

মনুষ্যত্ব কি ? (বিঃ প্রঃ—২য়) ॥

প্রঃ প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', ১২৮৪, আশ্বিন।

মনুষ্যত্বের আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই মানবজীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিভেদে উদ্দেশ্যের ভেদ আছে। কারো মতে ইহজীবনে ধনসম্পত্তি ভোগই উদ্দেশ্য, কারো মতে পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয়ই উদ্দেশ্য। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিস্তৃতিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।' এরই নাম মনুষ্যত্ব।

'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র জানান এই প্রবন্ধ—'জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনচরিতের সমালোচনার ভগ্নাংশমাত্র'।

মনুষ্যত্ব কি ? (ধর্মঃ | ৪) ॥

মনুষ্যত্বের আলোচনায় প্রথমেই গুরু-শিষ্যে গাছ সম্বন্ধে আলোচনার অবতারণা করেছেন। বট ও তৃণ উভয়েই বৃক্ষশ্রেণীভুক্ত হওয়ার যোগ্য। কারণ উভয়েরই কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল ও ফল আছে। কিন্তু তবুও তৃণের সব বৈশিষ্ট্যগুলিই ক্ষুদ্রতর। তাই তাকে বটের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। তেমনি মানবজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও পরিপূর্ণতার নামই মনুষ্যত্ব। দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকারেরই বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। অনুশীলনের দ্বারাই তাহা হওয়া সম্ভব। সাধারণতঃ এরূপ সর্বগুণযুক্ত মানুষ দেখা যায় না। সগুণ ঈশ্বরেরই এরূপ বিকাশ দেখা যায়। কৃষ্ণের মধ্যে এই সর্বগুণের বিকাশ দেখা যায়। তাই গুরু কৃষ্ণকে উপাসনা করেছেন।

মনুষ্যেভক্তি (ধর্মঃ | ১০) ॥

মানুষের কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির মধ্যে তিনটি বৃত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ—ভক্তি, প্রীতি, দয়া। এর মধ্যে আবার ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তবে এখানে ঈশ্বরে ভক্তি অপেক্ষা মানুষের প্রতি ভক্তির কথাই আলোচিত হয়েছে প্রথমতঃ সমাজে বা পরিবারে যাঁরা ভক্তিভাজন তাঁদের ভক্তি করা কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ সমাজের যাঁরা পালক—সেই রাজা বা শাসককেও ভক্তি করা দরকার। তবে শাসক যতক্ষণ সুশাসক, ততদিনই তিনি প্রজাগণের ভক্তির পাত্র। তৃতীয়তঃ সমাজের যাঁরা শিক্ষক তাঁরাও ভক্তির পাত্র। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণে ভক্তি এর উদাহরণ। তবে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—ব্রাহ্মণ অর্থে শ্রেষ্ঠ। যদি কোন ব্রাহ্মণ

আচার আচরণে হীন হন, তিনি ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র নন। অপরপক্ষে যদি কোন শূদ্রও আচার আচরণে শ্রেষ্ঠ হন, তিনি সমাজের ভক্তিভাজন হবার যোগ্য। চতুর্থতঃ ধার্মিক বা জ্ঞানী ব্যক্তি ভক্তির পাত্র। পঞ্চমতঃ কতকগুলি ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষের কাছে কতকগুলি মানুষ ভক্তির পাত্র। যেমন কর্মচারীর ক্ষেত্রে মনিব! তবে এখানে ভক্তির সঙ্গে ভয় না করাই উচিত। ষষ্ঠতঃ 'যাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য আছে, সে বিষয়ে তাহাকে সম্মান করিতে হইবে'। সপ্তমতঃ 'সমাজকে ভক্তি করিবে।' বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বর্তমান সমাজের অবনতির কারণ ভক্তির অভাব।

মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত (কৃঃ চঃ ১/২)॥

এখানে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। মহাভারতের আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'পর্বসংগ্রহাধ্যায়'। এটিকে সূচীপত্র বলা যেতে পারে, এখানে যে বিষয়ের উল্লেখ নেই সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলা যেতে পারে। এখানে যে তালিকা আছে তা থেকে মহাভারতের শ্লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৪,৮৩৬। কিন্তু ক্রমে দেখা যায় আরো এগারো হাজার শ্লোক বেড়ে গেছে। শুধু তাই নয়, মূল মহাভারত রচনার অনেক পরে এই সূচীপত্র প্রস্তুত হয়। ইতিমধ্যে অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। 'মহাভারত প্রথমতঃ উপাখ্যান ত্যাগ করিয়া চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকে বিরোচিত হয় এবং বেদব্যাস তাহাই প্রথমে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান।' সুতরাং এই চব্বিশ হাজার শ্লোকই মূল মহাভারত বলে গণ্য করা যেতে পারে।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা (কৃঃ চঃ ১ | ৩)॥

মহাভারতে অনেক অলৌকিক গালগল্প থাকার জন্য অনেকে তাকে ইতিহাস হিসাবে স্বীকৃতি দিতে চান না। কিন্তু প্রাচীনকালে রামায়ণ ও মহাভারত ইতিহাস আখ্যাই পেয়ে এসেছে। তবে মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষেপবাহুল্যের প্রধানতঃ তিনটি কারণ আছে। মহাভারত যখন প্রথম প্রচারিত হয় তখন লেখার মাধ্যম ছিল না। মুখে মুখে প্রচারের জন্য এতে প্রক্ষেপ বেশি আছে। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারত অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বলেই তাতে বেশি প্রক্ষেপ পড়েছিল। তৃতীয়তঃ পাশ্চাত্যদেশের ইতিহাসলেখকরা গ্রন্থরচনায় নিজেকে প্রধান্য দিতেন। ফলে তাঁদের রচনাগুলিকে চেনা যেত। কিন্তু এদেশে অনেকলেখক নিজের রচনা নামহীনভাবে অন্যত্র প্রবিষ্ট করিয়েছেন। মহাভারতেও এমন কতজনের রচনা আছে, তা কে বলতে পারে।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা—ইউরোপীয়দিগের মত (কৃঃ চঃ ১ | ৪)।

অনেক ইউরোপীয় মহাভারতের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেন না, কারণ এটি পদ্যে রচিত। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন সবকিছুই পদ্যে রচিত হত। কেবলমাত্র পদ্যে রচিত বলে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে মহাভারতের কালনির্ণয় সম্বন্ধে বিভিন্ন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের মতামতের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ (কৃঃ চঃ ৫ | ১)॥

মহাভারতের যুদ্ধের সূচনায় কৃষ্ণের কার্যকলাপ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। পরিচ্ছদের মধ্যেই তিনি বিষয় বস্তুর সারসংক্ষেপ দান করেছেন। "প্রথম—যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে, কাহারও

আপনার ধর্মার্থসংযুক্ত অধিকার পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাঁহার বিবেচনায় এতদূর উৎকৃষ্ট যে, বলপ্রয়োগ করার অপেক্ষা অর্দ্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল।

দ্বিতীয়ত—কৃষ্ণ সর্বত্র সমদর্শী। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাণ্ডবদিগের পক্ষ, এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ। উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য।

তৃতীয়—তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ একপ্রকারে বিরাগযুক্ত। প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তারপর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত হইল, এবং অগত্যা তাঁহাকে এক পক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরণ হইলেন। এইরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বত্যাগী ভীষ্মেরও নহে।"

মানস (বাল্যরচনা)॥

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থহিসাবে 'ললিতা তথা মানস' কাব্যগ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের 'মানস' একটি সুদীর্ঘ কবিতা। কবিতাটিতে বালকবয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক বেদনাব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সংসার ত্যাগ করে নির্জন অরণ্যের মধ্যে শান্তির সন্ধান খুঁজেছেন। তাই প্রথমেই বাল্মীকির বচন উদ্ধার করা হয়েছে।—

"ফলানি মূলানি চ ভক্ষয়ন্ বনে
গিরীংশ্চ পশ্যন্ সরিতঃ সরাংস চ।
বনং প্রবিশ্যেব বিচিত্রপাদপং
সুখী ভবিষ্যামি তবাস্ত নিবৃতিঃ॥"

'child Harold' থেকেও অনুরূপ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।—

There is pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore.'

দীর্ঘ কবিতাটিতে বনভূমির বর্ণনা ও সেইসঙ্গে কবির মনোভাবের প্রতিফলন বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অন্নদাময়ে রচিত কাহিনীকাব্যগুলিতেও অনুরূপভাবে বনভূমির প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটির শেষাংশে ভগবদ্ভক্তিও প্রকাশিত।—

'পরেতে গভীর স্থির জগৎসংসার।
কাঁদিয়া ঘুমালো যেন নবীন কুমার॥
যেন তাঁর করুণার প্রতিমা প্রকাশ।
পুজিবে গভীর মোহে, বিগত বিলাস॥
সঁপিয়া জীবন মন, যৌবন রতন।
এমন সুধীর মনে হইবে পতন॥
ভাবিব ঝটিকা মত ছিল মম মন।
এ গভীর স্থির মত হয়েছে এখন॥
কারো অনুরাগী নই বিনা সনাতন।
জপিয়া পবিত্র নাম হইব পতন॥

অনন্ত মহিমা স্মরি ছাড়িব এ দেহ।
জানিবে না শুনিবে না কাঁদিবে না কেহ॥
অনিবার জলরব কাঁদিবে কেবল।
আছে কি পৃথিবি হেন বিমোহন স্থল॥'

'পৃথিবি' বানানটি বঙ্কিমচন্দ্রেরই ব্যবহৃত।

মানসবিকাশ (পু: অপ্রঃ)॥

প্রঃ প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', পৌষ ১২৮০, পৃ, ৪০২-৪০৭।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত এবং কলিকাতা প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত গীতিকাব্য 'মানস বিকাশ'-এর সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটির আলোচনা একেবারে নেই বললেই চলে। গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে এটি একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ। গীতিকাব্যের উদ্ভব ও বিদ্যাপতিজয়দেবের গীতিকাব্যের প্রকৃতি এখানে আলোচিত। 'বিবিধপ্রবন্ধ' ১ম ভাগে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নামে যে প্রবন্ধটি স্থানলাভ করেছে, সেটি বহুলাংশে এরই অনুসরণ।

মাসিক সংবাদ (পু: অপ্রঃ)॥

প্রঃ প্রকাশ—'প্রচার', শ্রাবণ ১২৮৫। পৃ, ১৫৪-৫৫

যে দুটি সংবাদ এ বিভাগে প্রকাশিত হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিই বিচারবিভাগীয়। সংবাদদুটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্লেষমিশ্রিত মন্তব্য রয়েছে।

রাজতন্ত্র

না, রাজা বা রাজপুত্রদের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে বসিনি। আমার ঐ বিষয়ে জ্ঞান পাঠকদের অনেকের চেয়েও কম। আমি আমার প্রিয় বিষয় নাট্যশালার 'রাজতন্ত্র' নিয়েই আলোচনা করতে চলেছি।

প্রথমেই বলে রাখি, নাট্যশালার রাজতন্ত্র বলতে আমি কি বোঝাতে চাই। তার আগে ছোট্ট একটা গল্প বলি। এদেশে তখন বৃটিশ শাসনের স্বর্ণ যুগ অর্থাৎ যে সময়ে সাহেবদের ছাড়া কোনো কর্মই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতো না, সে যুগের কথা। এক জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজার আনুষঙ্গিক উৎসবে জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকে সাদর তথা বিনীত আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং মান্য অতিথির জন্য যথাযোগ্য চর্বচোষ্য লেহ্যপেয়ের ব্যবস্থাও হয়েছে। অধিকন্তু সাহেবকে খুশী করার জন্য অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার মধ্যে যাত্রা গানও আছে।

সাহেবতো 'তর' হয়ে এসে আসনে অধিষ্ঠান করেছেন, লক্ষণের শক্তিশেল গোছের কি একটা পালা হচ্ছে, কুশীলবরা কর্তাকে খুশী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিন্তু তিনি গুম হয়ে বসে। হঠাৎই রঙ্গস্থলে হনুমানের আবির্ভাব, তার লম্পঝম্প দেখে সাহেবের মুখে হাসি ফুটলো, এতক্ষণ পর্যন্ত যে তোড়ায় হাত পড়েনি তা প্রায় খালি হয়ে গেল।

নাটকীয় প্রয়োজন মিটতেই হনুমান নেপথ্যচারী আর সাহেবের মুখে শ্রাবণের মেঘভার। আসরে তখন করুণ রসের জোয়ার, চিকের আড়ালে ফোঁপানি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে, হঠাৎই সাহেব গৃহকর্তাকে ডেকে বললেন, হনু কোথায়? তাকে ডাকো।

গৃহকর্তা গিয়ে অধিকারীকে বললেন, এখনি হনুমানকে আসরে নামাও। অধিকারীর মাথায় হাত, তখনি হনুমানকে আসরে নামালে পালার আদ্যশ্রাদ্ধ, কিন্তু সাহেবকে খুশী করতেই হবে কাজেই এলো হনু। সাহেবের একজন হনুতে মন ভরলো না তিনি হাঁক ছাড়লেন, আউর হনু লাও। তাই আনতে হলো এবং শেষে রাম-রাবণ-লক্ষ্মণ-সীতা সকলেই লেজ লাগিয়ে হুপহাপ করে লাফাতে সুরু করলো। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত পালাগানের দফাটি রফা কিন্তু যন্মিনতুষ্টে জগতুষ্টে মন্ত্র জপ করেই আত্মরক্ষা করা গেল।

বর্তমানে আমাদের নাটমঞ্চে বা যাত্রা গানের দলগুলির কোন কোনটির পরিচালক তথা প্রযোজকের মধ্যে এমন সব সাহেব ঢুকে বসে আছেন। তাঁরা যেখানে সেখানে হনুমানের নৃত্য দেখালেই নাট্যশালার চরম বিকাশ ঘটছে এমন একটা ভাব দেখান এবং তাঁদের রুচিবিকারকে ভদ্র পোষাক পরাবার জন্য সর্বদাই বিদগ্ধ সমালোচকদের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেন। এঁরাই হলেন নাট্যশালার রাজতন্ত্রের ধারক ও বাহক।

এঁদের সৎ প্রচেষ্টায় বাংলা নাট্যশালা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা প্রকাশ করতে হলে দ্বিতীয় কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ হতে হয়। আমার কলমে সে জোর নেই সুতরাং বর্ণনা থাক।

যাঁরা নাটক ভালবাসেন তাঁরা কিন্তু রাজতন্ত্রের দাপটে মনে মনে 'ত্রাহি মধুসূদন' জপ করেছেন কারণ ওঁদের সৃষ্টিতে নাটক নেই যা আছে তা অবশ্য ব্যক্তিবিশেষের কাছে আজ উপাদেয় বস্তু যদিচ সকলের পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন। 'মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' শাস্ত্রীয় উক্তি নিঃসন্দেহে কিন্তু অন্যত্র প্রচুর প্রশংসা সত্ত্বেও মাধ্বীকে ব্যবহার করা চলে কি? আমাদের কোনো এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কাছে শুনেছি, একদা এক বিত্তবান সৌখীন নাট্যপ্রযোজক তাঁদের মঞ্চায়নে ল্যাজারসের বাড়ির আসবাব দিয়ে মঞ্চ সাজিয়ে বাস্তবতার চূড়ান্ত ঘটিয়েছিলেন এবং সে যুগের অনেকেই এই অতি বাস্তবতা নিয়ে হৈচৈ করেছিলেন। কিন্তু এ যুগের রাজতন্ত্রীয়দের কাছে তিনি নিতান্তই শিশু। কারণ এঁরা আস্ত হোটেল, চলন্ত ট্রেন, খোলা আসরে ফাঁসি দেওয়া—কিছুই জন সমক্ষে আনতে কসুর করেন নি এবং এখনো কিছু লোক এঁদের কীর্তিকলাপ দেখে উদ্বাস্তু বামনরিব নৃত্য করছেন।

এত সোরগোল সত্ত্বেও তাঁরা নাট্যশালাকে কি দিয়েছেন? পঞ্চাশের দশকে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত নট ছিলেন তাঁদের বাইরে নতুন কোনো নট সৃষ্টি করেছেন? নতুন কোনো নাট্যকার? চিরকালীন সাহিত্যে ঠাঁই পাবার মতো নাটক? আগের যুগে প্রতাপ চাঁদ জুহরী থাকলেও গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, বিনোদিনী তিনকড়িরাও ছিলেন বলে, নাটককে মেরে ফেলতে পারেন নি। এবার কিন্তু সে ব্যবস্থা প্রায় পাকা হয়ে যাচ্ছে।

একদা যে সব গোলা দর্শক গড্ডালিকা প্রবাহের মতো নাটক দেখতে গিয়ে টিকেট ঘরের বাক্স বোঝাই করছিলেন তাঁরাও কিন্তু নাক কোঁচকাচ্ছেন। উষর ভবিষ্যত স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে কিন্তু রাজা-রাজকুমাররা তুরীয় নিদ্রায় নির্বিকার। গণনাট্যের মতো নতুন একটা ধাক্কা একান্ত প্রয়োজন।

রবি মিত্র

'পুথিপাঠ' সহজ নয়

বৈশাখ সংখ্যা 'সমকালীন' এ শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ের 'পুথি-পাঠ' সহজ নয়' প্রবন্ধ পড়লাম। পুথিপাঠ সত্যিই খুব কঠিন। তবে এই প্রবন্ধে তিনি যে কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন তাহার দু'তিনটি বিষয় সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে। তাহা এই:

১। ২৩ পৃ: 'মল্লিকা শ্রীফল দল করি বীর হেতু কি'।

তিনি ইহার পাঠ 'মল্লিকা শ্রীফলদল করিবী কেতুকি (অর্থাৎ করবী কেতকী ইত্যাদি) ধরিয়াছেন। কিন্তু করবী শব্দের পর একটি 'র' লেখার জন্য তিনি পুথি লেখককে অনর্থক দোষী করিয়াছেন—যে কোন অভিধান দেখিলেই করবী ফুলের দুইটি প্রতিশব্দ দেখা যাইবে করবী ও করবীর।

২। ২৩ পৃ: ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের ঢেকুর পালায় ইছাই ঘোষের নগর বর্ণনায় এক মূলে আছে—

'করিয়া আসন গড়িল নিশান সম্মান বসান পদ্য।' এই 'পদ্য' শব্দের অর্থ লইয়া অদ্যাপি তাঁহার সংশয় কাটে নাই। পদ্য = পদ + য পদ হইতে জাত। 'বঙ্গবাসী সংস্করণে যে নীচ জাতীয় লোক' অর্থ লিখিত আছে তাহাই ঠিক। বৈদিক পুরুষশূক্তে আছে—'পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তা'। মনুসংহিতা ১।৩১—

লোকানাস্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং-মুখ-বাহুরু পাদত:
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তময়া॥

ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে পদ্য অর্থাৎ পদ্ভ্যাং যত: অর্থাৎ শূদ্র নীচজাতীয়। ধর্মপুরাণে যেখানে ডোম জাতীয় লোককে ধর্মঠাকুরের পূজক বলা হইয়াছে তাহাতে নীচজাতীয় (পদ্য) লোককে 'সসম্মানে' বসাইলে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

৩। ২১ পৃ: কাশীদাসী মহাভারতের দ্রোণ পর্বের পুথিতে

'কাশীরাম দাসের প্রভু নিল সেন রুড়।
দক্ষিণে অনুজ জার বামেতে গরুড়॥'

হইতে কয়াল মহাশয় পাঠোদ্ধার করিয়াছেন 'কাশীরাম দাসের প্রভু নিল সৈলারুড়—অর্থাৎ জগন্নাথ দেব'। কিন্তু নীলাচলে জগন্নাথদেব বলিতে সর্বপ্রথমে বলরাম তাঁর বামে সুভদ্রা এবং তাঁর বামে

জগন্নাথ সর্বজনবিদিত। জগন্নাথের দক্ষিণে কোন অনুজ বা বামে গরুড় নাই। আর বলরাম অনুজ নহেন তিনি অগ্রজ। সুতরাং কোন যুক্তিতেই কাশীরাম দাসের প্রভু জগন্নাথ সিদ্ধান্ত হয় না।

আমি কয়াল মহাশয়ের প্রবন্ধের মূল্য কম করিয়া দেখাইতে চাই না, বরং মূল্য বৃদ্ধি হউক এই কামনায় সাধারণে হিতার্থে এই বিষয়ে বিষম আলোচনা হওয়া ভাল মনে করি।

বিপিনবিহারী দাস

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস মহাশয় আমার অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের আলোচনা করে আমাকে সম্মানিত করেছেন, এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। দু'তিনটি ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আমার মতানৈক্য ঘটছে। বিপিনবাবু তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। এ সম্পর্কে আমারও কিছু বলার আছে। বিচারের ভার সুধী পাঠকসমাজের।

১। লিপিকার 'করিবীর' শব্দ লিখে অনাবশ্যক একটি'র'-এর আগমন ঘটিয়েছেন বলায় বিপিনবাবু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। দুটি কারণে আমি এই কথা বলেছি। প্রথমতঃ, আমার জ্ঞান অনুসারে লিপিকার শব্দবিকৃত এবং বর্ণ বা অক্ষরের উপস্থাপনে অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ নিয়মে পয়ার চতুর্দশাক্ষর ছন্দ। 'করিবীর' শব্দের শেষে অনাবশ্যক 'র'-এর আমদানি ঘটিয়ে ছন্দকে ভারাক্রান্ত করা কেন? এজন্য কবিকে দায়ী করা বোধ হয় সঙ্গত নয়।

২। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে, বিপিনবাবুর শ্রুতি ও স্মৃতির উদ্ধৃতি পাঠেও 'পদ্ম' শব্দের অর্থ সম্পর্কে আমার মনের সংশয় কাটল না। কেন কাটল না, তাই বলি। যে 'নীচ জাতীয় লোক'কে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্যের পুরোভাগে 'আসন' দেওয়া হল, ধর্মমঙ্গলের বহু স্থলে বহু জাতির উল্লেখ থাকলেও, সেই পদ্ম জাতির উল্লেখ আর পাওয়া গেল না। ডোমজাতি ধর্মঠাকুরের পূজক হলেও ঘনরামের ধর্মমঙ্গল ব্রাহ্মণকে বর্ণশ্রেষ্ঠ ('বর্ণগুরু ব্রাহ্মণে বিশেষ আমি যতি'—মায়ামৃত পালা) এবং ডোমকে 'রাঢ়' বলা হয়েছে ('জাতি রাঢ় আমিরে করমে রাঢ় ত'—জাগরণ পালা)। ইহাই ঘোষের নগরপত্তনে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি 'স্বজাতি'র বসতির পর নগরের প্রান্ত সীমায় ডোম, হাড়ি প্রভৃতি হীনজাতির বাসস্থল নির্দিষ্ট হয়েছে এবং তাদের বৃত্তিরও কোন উন্নতি ঘটে নি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা সমাজ সম্পর্কে ধর্মমঙ্গলের কবি সচেতন।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের (এবং অন্যত্রও) বহু স্থানে পদ্ম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। গত বৈশাখ সংখ্যায় আমি 'পদ্ম' ও 'সুপদ্ম' মিলিয়ে দুটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছিলাম। পুনরায় পদ্ম শব্দের পাঁচটি উদাহরণ তুলে ধরছি—পাঠকসমাজ আমার সংশয় দূর করবেন, এই প্রত্যাশায়।

কত পদ্ম বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে।—রঞ্জার বিভা পালা
ডাকে ধর্মজয়, পদ্ম বাদ্যময়, নাচে লুই বেত্রহাতে।—হরিশচন্দ্র পালা
নানা পদ্ম বাদ্য বাজে নাচে বেত হাতে।—শালে ভর পালা
লাউসেন কন পদ্ম অনলের ডরে

বন ছাড়ি আশ্রয় করিহু সরোবরে।—হস্তীবধ পালা
নানা পদ্মে বাদ্য বাজে সুরজাত্য করে।—কাঁউর পালা

পরমপুরুষের পদ থেকে নীচ শূদ্রজাতির উৎপত্তি বলা হয়েছে। শূদ্রাভিমানীর পক্ষ থেকে তো এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা নীচ বলেই কি দেবাদিদেব মহাদেবের শিরে স্থান পেলেন? নিজে পতিতা হয়ে কি করে তিনি 'পতিতোদ্ধারিণী' হলেন?

৩। 'কাশীরামদাসের প্রভু নীল শৈলারূঢ়' অর্থাৎ জগন্নাথদেব,-এ সিদ্ধান্তে এখনো আমি অটল। আমার অসতর্কতাবশতঃ পরবর্তী পংক্তির পাঠের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নি, এ-ত্রুটি আমি স্বীকার করছি। কাশীরাম দাসের মহাভারতের প্রাচীন পুথিতে এই ভণিতা পাওয়া যায়—কাশীরামদাস-প্রভু নীল শৈলারূঢ়। দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড়। এখানে 'গরুড়' অর্থে গরুড়স্তম্ভ নির্দেশিত হচ্ছে। ঐ ভণিতার পুথি আমার নিকট আছে, অন্যত্রও দুর্লভ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পুথির পাঠ আমাদের বিতর্কের বিষয় ছিল, সেটি ১২৩২ সালে অনুলিখিত একটি অর্বাচীন পুথি। সেখানে পাঠবিভ্রাট ঘটেছে, এই-ই আমার বক্তব্য।

অক্ষয়কুমার কয়াল

সমালোচনা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে সাধারণ মানুষ ॥ ড. উমা সেন। জিজ্ঞাসা। কলিকাতা-৯। মূল্য : বারো টাকা

আজকের পৃথিবীর রং অনেক বদলে গেছে। ইতিহাস না থাকলে পুরানো পৃথিবীর রেখাচিত্র আঁকা কোনদিনও সম্ভব হোতো না। এই পরিবর্তিত পৃথিবীর সঙ্গে মানুষেরও রূপান্তর ঘটেছে যুগে যুগে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পৃথিবী ও তার মানুষের কথা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে বিধৃত আছে। পিছন ফিরলেই কৌতূহলী পাঠকের চোখের সামনে সব ভেসে উঠবে। আজকের পৃথিবী ও মানুষকে স্পষ্টভাবে জানতে বা বুঝতে গেলে পুরানো পৃথিবী ও মানুষকে জানার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক-গবেষকরা তাঁদের গবেষণা গ্রন্থের মাধ্যমে এইসব কার্য্য নিষ্পন্ন করে থাকেন। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের বাংলাদেশে গবেষণার কাজে উৎসাহ বা উদ্দীপনার বিশেষ অভাব আছে। তাই বাংলাদেশের পুরানো ইতিহাস বা সাহিত্য অনুসন্ধানের কাজে বাঙালী লেখকসম্প্রদায়কে একসময়ে কাতর আহ্বান জানিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস ও সাহিত্য ক্রমান্বয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেসব পর্যালোচনাও হয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে। আজকের দিনেও নতুন গবেষকরা নতুন দৃষ্টি নিয়ে পুরানো দিনের সাহিত্যের মূল্যায়ন করছেন এবং তাঁদের গবেষণায় অনেক নতুন তথ্যও উদ্ঘাটিত হচ্ছে। এই রকম একটি গবেষণাগ্রন্থ উমা সেনের 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ'। সাধারণ মানুষের গুরুত্ব আজকের গণতান্ত্রিক যুগের সাহিত্যে বিশেষভাবে স্বীকৃতিলাভ করলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এদের তেমন বিশিষ্টতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। তার কারণও ছিল। দেবতা ও দেবানুগৃহীত মানুষকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনার একটি পদ্ধতি তখন প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটলেই সাধারণ্যে সে-রচনা আর গৃহীত হোতো না। সুতরাং সাধারণ মানুষের ভূমিকা দেবতা ও দেবানুগৃহীত মানুষের আড়ালে চাপা পড়তে বাধ্য হোতো। তবুও সাহিত্যে তাদের যে অস্তিত্ব যথেষ্ট অনুভব করা যায়-সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ডক্টর উমা সেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষের পরিচয় বিধৃত হয়েছে তাঁর গবেষণাগ্রন্থে। এই জাতীয় গ্রন্থ রচনার প্রথম প্রয়াস হিসাবে শ্রীমতী সেন বাংলাসাহিত্যানুরাগী পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' শ্রীমতী উমা সেন সাধারণ মানুষের স্বরূপ নির্ণয় করার প্রয়াস পেয়েছেন। যাঁরা দরিদ্র অবজ্ঞাত, মুখ্যতঃ তাদের বলা হয়েছে সাধারণ মানুষ। এই সাধারণ মানুষের পরিচয় তিনি কিভাবে অনুসন্ধান করেছেন দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য মন্থন করে, তারই একটা সংক্ষিপ্ত ইতিকথা এই 'মুখবন্ধে' দেওয়া হয়েছে। 'মুখবন্ধে'র একস্থানে শ্রীমতী সেন

লিখেছেন: 'মাণিকচন্দ্র রাজা, গোপীচন্দ্র তার রাণীরা, খেতুরা রাজা, স্বয়ং রাণী ময়নামতীও প্রকৃতপক্ষে অতি সাধারণ মানুষ'। এই উক্তি বিভ্রান্তিমূলক। সাধারণ মানুষের মত মানবিক দোষগুণ দেব-দেবী বা রাজা-রাণীর মধ্যে থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই বলে তাঁরা সাধারণ মানুষের পর্যায়ে পড়বেন এবং তাঁদের কথা যেসব সাহিত্যে প্রচারিত হবে, সে-সব সাহিত্য সাধারণ মানুষের সাহিত্য বলে বিবেচিত হবে, একথা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরাণী কখনই এক পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। যদিও আকবর বাদশার মধ্যে, হরিপদ কেরাণীর মত সাধারণ মানবিক গুণ থাকাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু শ্রীমতী সেন এই বিভ্রমে পড়েছেন এবং সাধারণ মানুষের স্বরূপ প্রকাশে যেসব উক্তি করেছেন তা বিতর্কের অপেক্ষা রাখে। গ্রন্থমধ্যে কোন কোন সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গেও এই বিভ্রমের-জের টেনেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত 'থিসিসে' এরূপ ত্রুটি অমার্জনীয়।

এই গ্রন্থের 'মুখবন্ধ' বাদ দিলে যেটি এই গ্রন্থের মুখ্য আকর্ষণ তা হচ্ছে লেখিকার বিষয় অনুসারে বক্তব্য সাজাবার চেষ্টা, অর্থাৎ গ্রন্থের পরিপাটি বিন্যাস-কৌশল। বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষের ইতিহাস বিবৃত করার আগে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সাধারণ মানুষের চিত্র কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার বেশ কিছু বিবরণ দিয়েছেন শ্রীমতী সেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বৈদিক সাহিত্য, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারত, বৌদ্ধ সাহিত্য, উত্তর কালীন সংস্কৃত কাব্যাদির আলোচনা করে সেখানে সাধারণ মানুষের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। এখানে শ্রীমতী সেনের অধ্যয়নপুষ্ট মনের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাসাহিত্যের আদিযুগের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় চর্যাপদে। সিদ্ধাচার্যদের সাধন-সংগীতগুলি সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবনকথা। শ্রীমতী সেন চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকির্তনের আলোচনায় সাধারণ মানুষের ছবি তুলে ধরেছেন। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের বৃহত্তম ধারা মঙ্গলকাব্য। শ্রীমতী সেন এই মঙ্গলকাব্যকে 'জনসাহিত্য,' বলে অভিহিত করেছেন। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল কাব্যে সমাজের নিম্নমধ্যবিত্ত স্তরের অধিবাসী পাত্রপাত্রী রূপে দেখা দিয়েছে। বহুল উদ্ধৃতিদ্বারা শ্রীমতী সেনের বক্তব্য আরো নির্ভরযোগ্য হয়েছে। নাথ-সাহিত্য, চরিত-সাহিত্য, পদাবলী-সাহিত্য ও লৌকিক সাহিত্যেও সাধারণ মানুষের মিছিল, বিশেষত বাংলার পল্লীজীবন কিভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে তারও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন শ্রীমতী সেন। এইভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাঁর প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষের পর্যালোচনা শেষ হয়েছে।

শ্রীমতী সেনের গবেষণাগ্রন্থে একটি নতুনত্ব চোখে পড়লো। অর্থাৎ গ্রন্থমধ্যে কোন প্যারাগ্রাফ্ বা অনুচ্ছেদ নেই। এটি নতুনত্ব, না ব্যকরণ গত নিয়ম লংঘনের ত্রুটি তা সুধী পাঠকসমাজই বিচার করবেন। গ্রন্থটির কাগজ ছাপা ও প্রচ্ছদপটে প্রকাশকের সুরুচি প্রশংসার দাবী রাখে।

অধীর দে।

বিদ্যাসাগর পরিক্রমা ॥ সন্তোষকুমার অধিকারী ও ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২ ॥ দাম পাঁচটাকা ॥

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে সভাপতি করিয়া যে 'দক্ষিণ কলিকাতা বিদ্যাসাগর সার্ধশত জন্মবার্ষিকী কমিটি' সংগঠিত হয়, তাহার, বর্ষব্যাপী কর্মসূচীর একটি প্রধানঅঙ্গ ছিল, বিদ্যাসাগরের জীবন ও আদর্শ বিশ্লেষণ-সম্বলিত একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ। 'বিদ্যাসাগর পরিক্রমা' তাহারই ফলশ্রুতি। কমিটিকে ও উহার সম্পাদক শ্রীব্রতব্রত চৌধুরী মহাশয়কে সেজন্য অভিনন্দন জানাইতেছি। সংকলনটির সম্পাদনার ভার ছিল শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর।

বাইশটি রচনা এই সংকলনে সন্নিবিষ্ট। সর্বশেষে একটি প্রশংসনীয় যোজনা, কবি নচিকেতা ভরদ্বাজ কৃত বিদ্যাসাগর-সম্পর্কিত গ্রন্থ-প্রবন্ধাদির পঞ্জী; যাহা পূর্ণাঙ্গ নয় এবং 'যথার্থই ক্ষুদ্র, সীমিত সংক্ষিপ্ত' বলিয়া বিনয়াবনতচিত্তে মুখবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন সংকলক।

রচনাগুলি সবই বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ নয়। কয়েকটিকে সশ্রদ্ধ প্রণাম বলা যায়। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন: বিভ্রান্ত একটি জাতিকে পরিচালিত করার জন্যই তাঁর মত বিরাট সত্তার আবির্ভাব। যুক্তিবাদী মননের ঔজ্জ্বল্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যেকটি আন্দোলনের পুরোভাগে তাই তিনি।

তারাশংকর দেখিয়াছেন তাঁহার বহুবিধ বিভূতি ও ছেদহীন শক্তি। 'স্বদেশী বনিয়াদের উপর বিদেশী উপকরণ মিশিয়ে তৈরী পরিণত চারিত্রের ও মননের ইমারত।···বিদ্যাসাগর টাকার দুই পিঠের দুই পৃথক ছবির মত, তার এক পিঠে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, অন্য পিঠে মানব-বোধ।'

'বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর স্বযুগের সন্তান, সে-যুগে ইউরোপ থেকে ভারতে প্রসারিত। স্বদেশে তাঁর পূর্বসূরী খুঁজতে হলে বৌদ্ধযুগে যেতে হয়', বলিয়াছেন শ্রীঅন্নদাশংকর রায়। রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রকে দুটি সমাদর্শ পুরুষ হিসাবে দেখিয়েছেন শ্রীদৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে ভারতবর্ষকে নবযুগের সড়কে এনে হাজির করলেন রামমোহন, আর সেই সড়ক ধরে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।' প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁহার প্রণাম-নিবেদনে বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগর প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক বিশ্বের সংযোগ সেতু।

'শিক্ষাব্রতী হিসাবে বিদ্যাসাগরের নানা কীর্তির কথা আলোচিত হয়ে থাকে, কিন্তু তাঁর শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে তেমন আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না।' এই মন্তব্য করিয়া প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীহিতৈষী, স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারে অনন্যচিত্ত। অন্যদিকে স্ত্রীশিক্ষার ভয়ানক পরিণামের আতংকে কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখিলেন বিদ্রূপাত্মক কবিতা। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া বাণী রায়ের মন্তব্য: দুই ঈশ্বরের প্রভেদ দেখলে বিস্ময়াদ্বিত হতে হয়!

'সমাজ-সংস্কারক' বিদ্যাসাগরের পরিচয় দিয়েছেন শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য সমাজ সংস্কারকরা পাশ্চাত্য আদর্শে আমাদের যে-সব প্রথা অযৌক্তিক ও দূষনীয়

মনে করেছেন তাদের দূর করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে এ-কথা প্রযোজ্য নয়।' মানবপ্রীতি তার মূল কথা পুঁথিগত তাত্ত্বিক সামাজিক আদর্শ নয়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর-রচিত একটি কঠোর 'প্রতিজ্ঞাপত্র' উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহাতে সমাজ-সংস্কারে উৎসাহীদের স্বাক্ষর দিতে হইত। ইহা কৌতূহলের উদ্রেক করে। ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁহার 'বাঙলাদেশে শিক্ষাবিস্তার ও বিদ্যাসাগর' শীর্ষক প্রবন্ধে দেশের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাপ্রণালীর রূপ নির্ধারণে বিদ্যাসাগরের বিস্ময়কর বাস্তববোধ ও বিচারশক্তির বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

বাংলাসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর-বিচার বিধৃত হইয়াছে তিনটি প্রবন্ধে। যথা, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'বাঙলাসাহিত্য ও বিদ্যাসাগর', ভবানী মুখোপাধ্যায় রচিত 'সাহিত্যকার বিদ্যাসাগর' ও ডঃ সুবর্ণা চৌধুরীর 'গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগর'। তাঁর মধ্যে ছিল একটি সাহিত্যিক সত্তা, যার পূর্ণ বিকাশে তিনি মন দিতে পারেন নি। বিদ্যাসাগর কবিতা লেখেন নি, অথচ কৌতুকের বিষয়, তাঁরই 'জল পড়ে পাতা নড়ে' রবীন্দ্রনাথের মনে কবিতার স্বাদ এনে দিয়েছিল প্রথম।··· বিষয়ানুগ ভাষা নির্বাচন, ভাষার মধ্যে শিল্পীজনোচিত সঙ্গতি-বোধ ইত্যাদি মন্তব্য ও আলোচনা আছে শ্রীধীরেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে। সাহিত্যসংক্রান্ত কোন কোন পত্রিকা বা প্রচেষ্টার সহিত বিদ্যাসাগর সংযুক্ত ছিলেন কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহার উল্লেখান্তে, তিনি যে একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তক, এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় ও ডঃ সুবর্ণা চৌধুরী।

রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ, দুই কবি,—এইন আলোচনা-সম্বলিত গ্রন্থলেখক শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংকলনে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার শিরোনাম বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ। বিশ্লেষণে ও ভাবসম্পদে সমান উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারীর 'জীবনশিল্পী বিদ্যাসাগর'। কবি সন্তোষকুমার ইতিমধ্যেই তাঁহার 'বিদ্যাসাগর' জীবনীগ্রন্থের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। 'শিল্পী যেমন তাঁহার মন্ত্রকে সুরে বাঁধেন, বিদ্যাসাগরও তেমনি নিজের জীবনকে সুরে বাঁধিয়াছিলেন। নিঃসঙ্গ হৃদয়ের নির্জন বেদনাবোধেই যে সৃষ্টির শতদল-পদ্মের জন্ম,' সন্তোষকুমার তাঁহার প্রবন্ধে সুন্দরভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

এই সংকলনের তথ্যপূর্ণ বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচিত অন্যান্য প্রবন্ধগুলির নাম: ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর 'ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ও বিদ্যাসাগর' শ্রীঅপূর্বকুমার সান্যালের 'বিদ্যাসাগরের একটি প্রবন্ধ' শ্রীউমা দেবীর সে-যুগের 'নারীসমাজ ও বিদ্যাসাগর' শ্রীগোরাচাঁদ মিত্রের 'ঈশ্বরবাদী বিদ্যাসাগর' শ্রীসুরেশপ্রসাদ নিয়োগীর 'বিদ্যাসাগরের অপ্রকাশিত চিঠি' এবং ডঃ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মুদ্রণশিল্পে বিদ্যাসাগর' ইতিহাসাচার্য ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কিছুদিন পূর্বে রামমোহন বিচার প্রসঙ্গে এক নতুন মন্তব্য করিয়া আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানকার প্রবন্ধেও তাহার প্রাসঙ্গিক আভাস আছে।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জনের প্রবন্ধে পূর্ণাঙ্গ ভারতেতিহাস রচনার জন্য বিদ্যাসাগরের ব্যাকুলতার বিষয়টি যেমন মর্মস্পর্শী তেমনই চিন্তনীয়। শ্রীঅপূর্বকুমার সান্যালের 'বিদ্যাসাগরের একটি প্রবন্ধ' সম্পর্কে আলোচনাটি উৎকৃষ্ট রচনা। কাব্যসমালোচক বিদ্যাসাগরের পর্যাপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হইয়াছে। "সংস্কারবর্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তায় সব কিছুকে বিচার করিয়া গ্রহণ করার যে পদ্ধতি বিদ্যাসাগরের

সর্বকার্যের মধ্যে অনুস্যূত তাহারই প্রতিফলন বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধেও ঘটিয়াছে"। মুদ্রণশিল্পে বিদ্যাসাগরের অবদান সম্পর্কে যে আলোচনা ডঃ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সূত্র ধরিয়া গবেষণা প্রয়োজন। রম্যরচনার মেজাজে লেখা প্রবন্ধে ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে যে কত সুন্দরভাবে পরিবেশন করা যায় তাহার নিদর্শন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের "কিংবদন্তীর বিদ্যাসাগর"।

'বিদ্যাসাগর পরিক্রমা' সংকলনটি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। পড়িতে পড়িতে বারবার মনে হয়, 'বিদ্যাসাগর' 'করুণাসাগর' কোনোটিই সেই বিশাল মহাপুরুষের পূর্ণ পরিচয়বহন করে না। বোধ হয় তাঁহাকে 'ভারত মহাসাগর' বলিলে তবু অনেকখানি বলা হয় কারণ ভারতের অনেক তরঙ্গ বক্ষে ধারণ করিয়াই তিনি বঙ্গোপকূলে আছাড় খাইয়া শুধুমাত্র বঙ্গোপসাগর।

যাহা হউক, সংকলনটির বহুল প্রচার কাম্য। যদিও, অসংখ্য ছাপার ভুলের মধ্যে সম্পাদনার গুরুদায়িত্বের প্রতি উদাসীনতাই প্রতিফলিত হইয়াছে। এবং, নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট লেখকের মধ্যে বণ্টন করিয়া না দেওয়ার বিষয়ের পুনরুক্তিদোষ পরিলক্ষিত হইয়াছে।

সরিৎশেখর মজুমদার

★ ARUNA ★

more DURABLE
more STYLISH

SPECIALITIES

Sanforized :
Poplins
Shirtings
Check Shirtings
SAREES
DHOTIES
LONG CLOTH
Printed :
Voils
Lawns Etc.
in Exquisite Patterns

ARUNA
MILLS LTD.
AHMEDABAD

★ ARUNA ★